দাম : ষোলো টাকা

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা রক্ষায় গুরু নানকের মত ও পথের পুনঃস্মরণ অত্যন্ত জরুরি
— পৃঃ ২৩

স্বস্তিকা

সনাতন ভারতের গুরু পরম্পরার উত্তরাধিকার শিখপন্থ— পৃঃ ২৮

৭৬ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।। ২৭ নভেম্বর, ২০২৩।। ১০ অগ্রহায়ণ - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২৭ নভেম্বর - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

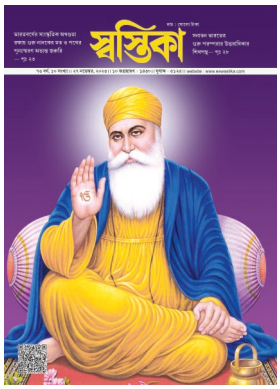

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'ভারত বিশ্বের তাই বিশ্বকাপও ভারতের' তবে মমতার রান আউট অবশ্যম্ভাবী □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

রঙ্গা হরিজী : এক অখণ্ড দীপসত্তা □ জে. নন্দকুমার □ ৭

সন্ত্রাসীরাই সন্ত্রাসবাদের বড়ো সমর্থক □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১১

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে তুলনামুলকভাবে দেশে কর্মসংস্থান অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে □ আনন্দ মোহন দাস □ ১৩

নিউজক্লিকের ঘটনায় কমিউনিস্টদের মুখোশ অনেকটাই খুলে গিয়েছে □ সুদীপনারায়ণ ঘোষ □ ১০

বাঙ্গালি হিন্দু এবং ইহুদি একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ □ সুশান্ত মজুমদার □ ১৭

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা রক্ষায় গুরু নানকের মত ও পথের পুনঃস্মরণ অত্যন্ত জরুরি □ পিন্টু সান্যাল □ ২৩

স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গিতে শিখ সম্প্রদায় হিন্দুধর্মেরই উত্তরাধিকারী □ কল্যাণ গৌতম □ ২৫

সনাতন ভারতের গুরু পরম্পরার উত্তরাধিকার—শিখপন্থ □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ২৮

ব্রহ্মা, ঈশ্বর, ভগবান ও দেবতা একই অঙ্গে বহুরূপ, একেই বহু, বহুতে এক □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

ফসলের উৎসব করমপুজো □ রবিব্রত ঘোষ □ ৩৪

বঙ্গভূমি অপেক্ষা করছে আর এক গোপালের আবির্ভাবের □ গোপাল চক্রবর্তী □ ৩৬

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী □ প্রদীপ মারিক □ ৩৭

কেদারনাথের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেয়নি কেউই □ হীরক কর □ ৪৩

মামণিরা মরলে দিদির কী! □ সুন্দর মৌলিক □ ৪৬

বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের হার খুশি করল কাদের? □ বিশ্বামিত্র □ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ রঙ্গম : ৩৮ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ স্মরণে : ৪৮ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯

প্রকাশিত হবে ৪ ডিসেম্বর, ২০২৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৪ ডিসেম্বর, ২০২৩

শীতে সুস্থ থাকুন

দোরগোড়ায় শীত। শীতঋতু আমাদের কাছে বড়োই মধুর। বিশেষ করে ভোজনরসিক, ভ্রমণবিলাসী বাঙ্গালি যেন আলাদা প্রাণশক্তি পায়। পিকনিক আর ঘুরে বেড়ানো দুটোই চলে সমানতালে। কিন্তু শীতের আমেজ পুরোমাত্রায় উপভোগ করতে হলে সবার আগে শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে। কারণ শীতকালীন বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবও কম নয়। তাই শীতের মরশুমে সুস্থ থাকতে কী করণীয় সেই বিষয়ে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় আলোচনা করবেন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ বিভিন্ন সম্প্রদায়

ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টি এই ভারতবর্ষ। বিশাল এই দেশে কতই না বৈচিত্র্য। ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, আচার-ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে কত না মত-পথ। কত না দর্শন। কত না উপাসনা পদ্ধতি। একই গৃহে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্যের সহাবস্থান। শুধু তাহাই নহে, নাস্তিক্য দর্শনে বিশ্বাসীরাও এই ভূমিতে মান্যতা পাইয়াছেন। সর্বসমাবেশকতাই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের সন্ধানই ভারতবর্ষকে মহান করিয়াছে। দৃশ্যত পৃথক হইলেও সকলেই যে একই পরমাত্মার অংশ, সকলেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডের জড়-চেতন সমস্ত কিছুর মধ্যেই পরমাত্মাকে অনুভব করিয়াছেন। ভারতবর্ষে উদ্ভূত সমস্ত মত-পথ-সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করিয়াছে। সমস্ত মত-পথ-সম্প্রদায়ের সমন্বয়েই এই দেশে মহাজাতি গঠিত হইয়াছে। সকলেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই মত-পথ-সম্প্রদায়গুলিই সমাজ তথা রাষ্ট্রজীবনে আগত আবিলতার সংস্কার সাধন করিয়া পুনর্জীবন দান করিয়াছে। বৈদেশিক আক্রমণে জাতি যখন ভীত সন্ত্রস্ত, দিশাহারা ও বিভ্রান্ত, সেই সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে আবির্ভাব গুরু নানকের। এক ওঙ্কার, এক ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করিয়া তিনি শিখপন্থের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মানুষের জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সমাজজীবনে স্থিরতা আনয়ন করিয়াছেন। দেশে বিদেশে সেই বার্তা প্রচার করিয়াছেন।

সর্বভূতে তিনি পরমাত্মার উপস্থিতি অনুভব করিলেও ধর্মদ্বেষী বৈদেশিক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধেও সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সমাজকে জাগ্রত রাখিবার জন্য তিনি গুরু পরম্পরার প্রচলন করিয়াছেন। শিখপন্থের মাধ্যমে পঞ্জাবপ্রদেশ একটি সঙ্ঘবদ্ধ সমাজে পরিণত হইয়াছে। সময়ের আহ্বানে দেশ, জাতি ও ধর্মরক্ষায় দশমগুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁহার অনুসারীদিগকে যোদ্ধা জাতিতে পরিণত করিয়াছেন। মুঘল অত্যাচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় প্রাচীরসম তাঁহারা ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছেন। গুরুবাণীর আদর্শে সুশৃঙ্খল শিখসম্প্রদায় পঞ্জাব প্রদেশকে ভারতবর্ষের শস্যভাণ্ডার এবং সামরিক শক্তির উৎসস্থলে পরিণত করিয়াছে। ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

শত শত বৎসর ব্যাপী তুর্কি-পাঠান-মুঘলের অত্যাচারী শাসন ভারতবর্ষের একতার মাঝে মিলন মহানের সুরটি ছিন্ন করিতে পারে নাই। কিন্তু সুচতুর ব্রিটিশরা তাহা ছিন্ন করিবার প্রয়াস করিয়া কিছুটা হইলেও সফল হইয়াছে। তাহারা এই দেশে বিভেদের বীজ বপন করিয়াছে। ভারতবর্ষের শক্তি যে বিভিন্ন সম্প্রদায়, তাহাদিগকে মূল হইতে ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা প্রচার করিয়াছে, এই দেশের সম্প্রদায়গুলি হিন্দু সমাজের অঙ্গ নহে। ভারতের যোদ্ধা জাতি শিখসম্প্রদায়কেও পৃথক করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ফলস্বরূপ, স্বাধীনতার পূর্বেই কিছু পথভ্রষ্ট শিখ পৃথক খালিস্তানের দাবি তুলিয়াছে। এক সময় পঞ্জাব-সহ সমগ্র দেশকে তাহারা অশান্ত করিয়াছে। এখনো দেশে-বিদেশে তাহারা দেশবিরোধিতার আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে সমগ্র শিখ সমাজ তাহা সমর্থন করিতেছে না।

ভারতের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যখন দেশকে এক জাতি এক প্রাণ রূপে গড়িবার প্রয়াস করিতেছে, তখন কংগ্রেস, কমিউনিস্টরা বিভেদের রাজনীতিতেই মাতিয়া রহিয়াছে। ব্রিটিশদের ন্যায় তাহারাও বলিয়া চলিয়াছে শিখেরা হিন্দু নহে। তাহারা জানেন না যে ,গুরু নানক এবং সমগ্র গুরুবাণীতে ছত্রে ছত্রে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের কথাই রহিয়াছে। বেদ বিরোধী একটি বাক্যও সমগ্র গুরুবাণীর কোথাও পাওয়া যাইবে না। বিভেদকামীরা যতই বিভেদের বীজ বপন করুক না কেন ভারতকে তাহারা আর ভাঙিতে পারিবেন না। তাহাদের অপচেষ্টা বারে বারে ব্যর্থ হইয়াছে এবং হইতেই থাকিবে। শুধু দেশবাসীকে ইহাদের হইতে সাবধান থাকিতে হইবে।

সুভাষিতম্

মনস্যেকং বচস্যেকং কর্মণ্যেকং মহাত্মনাম্।
মনস্যন্যৎ বচস্যন্যৎ কর্মণ্যন্যৎ দুরাত্মনাম্।।

মহান ব্যক্তিদের মনে যে ভাবনার উদয় হয়, তাঁরা সেই রকমই বলেন এবং সেই রকমই কাজ করেন। কিন্তু দুরাত্মারা এর বিপরীতে মনে এক রকম, বলাতে অন্য রকম আর কাজে আরও অন্য রকম।

‘ভারত বিশ্বের তাই বিশ্বকাপও ভারতের’ তবে মমতার রান আউট অবশ্যম্ভাবী

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বসুধৈব কুটুম্বকম্। তাই ক্রিকেট বিশ্বকাপ কেবল অস্ট্রেলিয়ার নয়। তা ভারতেরও বটে। এটা ভাবতে অনেকটা উদার হতে হবে যা অতীব কঠিন। ভাবাটাও শক্ত। তবে ভাবতে পারলেই বোঝা যাবে ভারতের সনাতন আর চিরাচরিত সত্য আর ধর্ম কী। ১৯৮৩ আর ২০১১-র ভারতের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের গল্প ২০২৩-এ কেন লেখা হলো না তা জানিয়েছেন এক নামজাদা সাহিত্যিক। ইতিহাস কীভাবে ফিরে আসে বলা কঠিন। তাই ২০২৭-এর আশা রাখা প্রয়োজন।

২০১১-তে ভারত বিশ্বকাপ জিতলেও এ রাজ্যে রাজনৈতিক হতাশা কিন্তু ওই বছর থেকেই চালু হয়। ২০১৩ থেকে দুর্নীতির কালো মেঘে রাজ্যের আকাশ ছেয়ে যায়। বিরোধী শূন্য হয়ে যাওয়া রাজ্যের হতাশাগ্রস্ত মানুষ তাই তিনবার তৃণমূল সরকারকে জিতিয়ে এনেছে। খানিকটা বাধ্য হয়ে। হতাশার শুরু আশির দশকে বিদেশি কমিউনিস্ট পন্থীদের হাত ধরে। ব্রিটিশ শাসনের মতো তারাও এ রাজ্যে ৩৪ বছরের বিদেশি কমিউনিস্ট শাসন কায়েম করেন। তিন দশক ধরে চলা বাম পীড়নের যন্ত্রণার আগুনে ঘি ঢালে তৃণমূল। মনে হয় জাতীয়তাবাদী বিজেপির হাত ধরে তার অবসান ঘটবে।

২০২৭-এ ভারত আবার বিশ্ব ক্রিকেটে পুনরায় যোগ্য আসন পাবে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে সে আঁচ পাওয়া যাবে। তার জন্য খুনসুটি ছাড়তে হবে। সক্রিয় আন্দোলনের ভিতর দিয়ে রাস্তা কাটতে হবে। দীর্ঘ ৪৬ বছর ধরে জমে থাকা হতাশাকে সরাতে হবে। রাজস্থান নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিরোধীদের ঠাট্টা করে বলেছেন ওই রাজ্যের শাসক কংগ্রেস দলে একজন খেলোয়াড় অন্যজনকে রান আউট করে দিতে বেশি আগ্রহী। শোনা যাচ্ছে ৩ ডিসেম্বরের পর রাজস্থান বিজেপির করায়ত্ত হতে পারে। এখন মমতার তৃণমূলেও প্রত্যেকে প্রত্যেককে রান আউট করে দিতে চাইছে। দলের দায়িত্বে মমতা ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাইছেন। দলের বৃদ্ধরা তাই অভিষেককে রান আউট করে দিতে চাইছেন। বৃদ্ধদের ভিতর মমতা আবার কয়েকজনকে রান আউট করে দিতে চাইছেন। যারা অভিষেককে জায়গা দিতে নারাজ।

অভিষেক বিরোধী বৃদ্ধরা মমতাকে চাইছেন আর চাইছেন অভিষেকের শাস্তি হোক যাতে তারা হাঁফ ছাড়তে পারেন। অভিষেক ক্যাম্প চাইছে অভিষেক বিরোধী ওই বৃদ্ধ গুপ্ত সমিতির সদস্যরা শীঘ্র নিকেশ হোক। ক্যাম্পের প্রথম সারিতে রয়েছে দলের পরামর্শদাতা সংস্থা যার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে ২০২৬ পর্যন্ত। দলের ভিতর কানামাছির এই লড়াইয়ে শামিল কিছু আমলা। মমতা আমলা আর পুলিশ নির্ভর প্রশাসন চালান। তাই বিরোধীরা পুলিশকে ‘পাপোশ’ পুলিশ বলে ডাকে। দাবিটার সমর্থনে বহু প্রমাণ রয়েছে। জয়নগর কাণ্ড সর্বশেষ বড়ো প্রমাণ। মমতা বিরোধী সমালোচনার বেশিরভাগটাই সামলায় মুখ ঢাকা আমলার দল। বিদেশি বামেদের জমানার প্রথম দিকটাও তাই ছিল। জ্যোতি বসু আমলা নির্ভর ছিলেন। তাই ২০০০ সালে দলের দিল্লি নেতারা জোটবদ্ধ হয়ে তাকে আউট করেন। মমতার ক্ষেত্রে আলাদা নয়। ভাইপোর রান আউট আটকাতে মমতা কোমর বেঁধে নেমেছেন। ভাবছেন সামলে দেবেন। তবে এটা মানতে রাজি নন যে তার হাত ধরে রাজ্য রাজনীতিতে বেড়ে ওঠা ভাইপো তাকে কোনো দিন রান আউট করে দিতে পারেন। আর তা হলে মমতার রান আউট অবশ্যম্ভাবী।

> **মমতা জানেন তিনি যে পিচে এখন ব্যাট করছেন সেটা তাঁর জন্য মোটেই সুবিধার নয়। কংগ্রেসে থাকাকালীন নিজের দলের ভিতর মমতা সোমেন মিত্র আর প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীদের ‘পেস’ বা জোরে বল খেলে জিতেছেন। ঘরের ‘ঘুর্ণি’ বা স্পিন পিচে প্রথম খেলছেন। অনভিজ্ঞ মমতা যে তাতে ফেল করবেন তা একপ্রকার নিশ্চিত।**

মমতা জানেন তিনি যে পিচে এখন ব্যাট করছেন সেটা তাঁর জন্য মোটেই সুবিধার নয়। কংগ্রেসে থাকাকালীন নিজের দলের ভিতর মমতা সোমেন মিত্র আর প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীদের ‘পেস’ বা জোরে বল খেলে জিতেছেন। ঘরের ‘ঘুর্ণি’ বা স্পিন পিচে প্রথম খেলছেন। অনভিজ্ঞ মমতা যে তাতে ফেল করবেন তা একপ্রকার নিশ্চিত। এই সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। রাজস্থান বিজেপির অ্যাসিড টেস্ট।

একইভাবে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ২০২৪-এর লোকসভায় অগ্রগতি আর ২০২৬-এর বিধানসভায় জয় এই রাজ্যের বিজেপির অগ্নিপরীক্ষা। তাই পরিস্থিতি বিচার করে এটা বলাই চলে যে ঘরে বা বাইরে মমতার ‘রান আউট’ কিংবা ‘হিট উইকেট’ প্রায় নিশ্চিত।

অতিথি কলম

জে. নন্দকুমার

রঙ্গা হরিজী
এক অখণ্ড দীপসত্তা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক শ্রী রঙ্গা হরিজী রাজা রন্তিদেবের পরম্পরাভুক্ত ছিলেন। তিনি 'দান'কেই জীবনের একমাত্র ধর্ম ও মূলমন্ত্রে রূপান্তরিত করেছিলেন, তাই মানবকল্যাণের কাজের প্রতি নিজের সম্পূর্ণ জীবন সমর্পণ করলেন। 'আত্মানো মোক্ষার্থম্ জগৎ হিতায় চ' বাণীর উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য ছিলেন হরিজী। কেরালার স্বয়ংসেবকদের প্রিয় 'হরিয়েত্তন'। ছয় বছর আগে তিনটি শ্লোক রচনার মাধ্যমে রঙ্গা হরিজী তাঁর যে অন্তিম প্রার্থনা প্রকাশ করেন, তা এরকম—

মামিকান্তিম্ প্রার্থনা

করণীয়ম্ কৃতং সর্বম্
তজ্জন্ম সুকৃতং মম
ধন্যোস্মি কৃতকৃত্যোস্মি
গচ্ছাম্যদ্য চিরং গৃহম্ ॥ ১ ॥
কার্যার্থং পুনরায়াতুম্
তথাপ্যাশাস্তি মে হৃদি
মিত্রৈ সহ কর্ম কুর্বন্
স্বান্তঃ সুখমবাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥
এষা চেৎ প্রার্থনা ধৃষ্টা
ক্ষমস্ব করুণানিধে
কার্যমিদং তবৈবাস্তি
তাবকেচ্ছা বলীয়সী ॥ ৩ ॥

এই অসাধারণ শ্লোকত্রয় হলো রঙ্গা হরিজীর অখণ্ড জীবন দর্শন। রাষ্ট্র নির্মাণে ও মানব সেবাব্রতের কঠিন লক্ষ্যে অবিচল থেকে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবন সঙ্ঘের প্রতি উৎসর্গ করেছেন। স্বয়ংসেবক রূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে সঙ্গী স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে একত্রে অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণই ছিল তাঁর জীবনের শেষ ইচ্ছা।

সরল-সুন্দর-প্রগাঢ় ভাবমূর্তি

সঙ্ঘের প্রারম্ভিক দিনগুলোতে, যখন সত্যনিষ্ঠ আদর্শের সংস্পর্শে সদ্য এসেছি, সেই সময় তথাকথিত 'প্রগতিশীল শিল্প ও সাহিত্য আন্দোলন' কর্মীদের দ্বারা প্রচারিত বস্তুবাদী নীতি এবং ভাষণের মারপ্যাঁচে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হই। সেই সব মতের বিপ্রতীপে সঙ্ঘের শাখা হতে প্রাপ্ত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রবাদী বিচারধারা, হিন্দুত্বের মহান পরম্পরা সংক্রান্ত জ্ঞান এবং মানবিক গুণসমূহের বিকাশলাভের প্রক্রিয়ার গুরুত্ব আমার মনকে ভারমুক্ত করে হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে দেশাত্মবোধক চেতনার সঞ্চার করে , যা ছিল আমার জীবনে এক নতুন ভোরের সংকেত। এরই মাঝে জানতে পারলাম পণ্ডালমে আয়োজিত হতে চলা সঙ্ঘের এক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে চলেছেন স্বয়ং হরিয়েত্তনজী। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর সেখানে একত্রিত অন্য স্বয়ংসেবকদের মতো আমিও তাঁর ব্যক্তিত্বের অদ্ভুত আভায় অভিভূত হয়ে গেলাম। কথা বলার

সময় তাঁর সদাহাস্যময় মুখমণ্ডল তাঁর কথাগুলোকে যেন আরও সুন্দর ও অর্থবাহী করে তুলতো। তাঁর বক্তব্যে সঙ্ঘের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করি। সেই বৌদ্ধিক রশ্মির ছটায় আজও আলোকিত হয়ে চলেছে আমার জীবন। 'Only' (যার অর্থ, এক ও একমাত্র কেবল সত্য) এবং 'Also' (যার অর্থ, অন্য সবকিছুও সত্য)— এই দুটি ইংরাজি শব্দের প্রয়োগ করে অন্য মতের থেকে পৃথক এবং ভিন্ন বিচারধারার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে চলা হিন্দুত্ব ও হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব সম্পর্কে তাঁর সেই অসাধারণ ব্যাখ্যা আজও আমার স্মৃতিপটে চিরঅম্লান।

প্রেম ও স্নেহের স্পর্শ

একজন কুশলী শিল্পীর উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম যেমন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনভাবে একজন কার্যকর্তা কোন মূল্যবোধসমূহকে পাথেয় করে জীবনে এগিয়ে চলবেন সেই বিষয়ে রঙ্গা হরিজীর জীবন যেন এক পথপ্রদর্শক। ১৯৮৪ সালে তাঁকে পাঠানো চিঠির প্রত্যুত্তরে তাঁর লেখা চিঠি পাওয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁর সঙ্গে বিজড়িত স্মৃতির সূত্রপাত। তখন আমি কেরলের সীতাথোড় খণ্ডে বিস্তারকের দায়িত্বপ্রাপ্ত। পণ্ডালম্ খণ্ড কার্যবাহের দায়িত্বে থাকার সময় জেলা প্রচারক এ.এম.কৃষ্ণনের নির্দেশে আমার প্রতি ওই দায়িত্ব অর্পিত হয়। রাজনৈতিক হিংসা এবং সেই সন্ত্রাসের পরিণামে সংঘটিত হত্যার কারণে সেই অস্থির সময়ে সঙ্ঘের গতিবিধি কার্যত রুদ্ধ হয়ে পড়ে। স্বয়ংসেবকদের অক্লান্ত প্রয়াসে ধীরে ধীরে শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। যে খণ্ড হতে কারও অংশগ্রহণের সম্ভাবনা ছিল না, সেখান থেকে ১৮ জন কার্যকর্তা সেই বছরের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে অংশগ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের পর রন্নি-র কার্যালয়ে আমরা রাত্রিযাপন করি এবং পরের দিনই সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে যোগদানের যোজনা স্থির করি। কার্যালয় প্রাঙ্গণে স্বয়ংসেবকরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন এই পরিকল্পনার উদ্রেক হয়। এতজন স্বয়ংসেবকের যোগদান ছিল অভূতপূর্ব এবং তা কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিল না।

হঠাৎই নিজের অজ্ঞাতে এই কৃতিত্বে 'আমিত্বের' একটা ভাব যেন গ্রাস করে আমার চেতনাকে। আমার এই উপলব্ধি তৎকালীন প্রান্ত প্রচারক হরিয়েত্তনজীকে জানানোর প্রয়োজন প্রবলভাবে অনুভব করি। কালক্ষেপ না করে তৎকালীন মহকুমা প্রচারক কৃষ্ণন কুট্টিয়েত্তনের ঘুম ভাঙিয়ে তাঁর থেকে একটি ইনল্যান্ড লেটার সংগ্রহ করে হরিয়েত্তনের উদ্দেশে একটি বিস্তারিত চিঠি লিখে ফেলি। কীভাবে এই কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করলাম— তার বর্ণনা লিখে চিঠি শুরু করে নতুন শাখাগুলো কীভাবে শুরু করা হলো এবং এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কতবার আমায় থানায় যেতে হলো ইত্যাদি বিষয়ে চিঠিতে লিখলাম। চিঠির শেষে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ সম্পর্কিত আমার উপলব্ধির উল্লেখ করলাম। পরের দিন তিরুভাল্লা যাওয়ার পথে চিঠিটি পোস্ট করে দিলাম।

চিঠিটি পোস্ট করার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর উত্তরের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষারত ছিলাম। চারদিন পর তাঁর চিঠি পেলাম। সুন্দর হস্তাক্ষরে— 'প্রেম ও স্নেহের সহিত আমার প্রিয় নন্দনের প্রতি' লেখাটি দিয়ে তাঁর চিঠির শুরু। চিঠিটি পড়তে গিয়ে মনের মধ্যে যেন সহস্র প্রদীপ জ্বলে উঠলো। চিঠির প্রথম অংশে তিনি কিছু সাধারণ সময়োপযোগী কথা লিখেছিলেন, যেমন— নতুন কার্যক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের সময় কোন্ বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক, এছাড়াও আমার মা-কে নিয়মিত চিঠি লিখি কিনা সেই কথাও ছিল। চিঠির শেষে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের বিষয়ে একটি পঙ্‌ক্তি তিনি লিখেছিলেন। তাঁর সেই প্রশ্নটি আমার অহমিকার ফানুসটিকে ফুটো করে দেয়। তিনি লিখেছিলেন— 'আমি জানতে পারলাম যে সীতাথোড় হতে ১৮ জন স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করছেন। কিন্তু নন্দন কি কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যে সেখানে দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়েছে?'

প্রথমবার পড়ে ওই কথার অর্থ বুঝতে পারিনি। পরে অনুধাবন করি যে সঙ্ঘের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনের এই সফরে, এই অর্জিত সাফল্য নিতান্তই ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন, যা আত্মগৌরবের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আমার চিঠিতে আমি ভুলক্রমে উল্লেখ করেছিলাম। 'যদি একাধিক অক্ষর দিয়ে শব্দ গঠন করা যায় এবং সার্থক শব্দাবলী দিয়ে বাক্য রচনা করা যায়, তবে উৎকৃষ্ট জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে'— এই পাঠ হরিয়েত্তনজী আমায় দান করেন।

অসাধারণ স্মরণশক্তি

একজন ব্যক্তি একটি বই ভীষণ তাড়াতাড়ি পড়ে শেষ করে ফেলেছেন এরকম একাধিক উদাহরণ পাওয়া যায়। এই ব্যাপারটি কোনো বিষয়ের প্রতি এই ব্যক্তির গভীর একাগ্রতার নির্দেশক। একবার আমি স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে একটি ছাত্র প্রশ্ন করে— 'এটি কি কোনোভাবে অতিশয়োক্তি নয়?' সেই প্রশ্নের উত্তরে আমি হরিয়েত্তনজীর উদাহরণ দিয়েছিলাম। চেরপুতে আয়োজিত হয়েছিল সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ, সেই কার্যক্রমে তখন দিন-রাত ব্যস্ত ছিলাম। একদিন রাতে সব কাজ শেষ করে আমার ঘরে শুতে যাওয়ার সময় অধিকারী বিভাগের বারান্দা থেকে আলো জ্বলতে দেখলাম। সেখানে আলো নেভানোর জন্য গিয়ে হরিয়েত্তনজীকে বই পড়তে দেখলাম। তিনি বইয়ের মধ্যে এতটাই মগ্ন ছিলেন যে ঘরে ঢোকার সময় আমার হাঁটা-চলার শব্দও শুনতে পাননি। তিনি ড. ভি. শেষগিরি রাও রচিত 'The End of a Scientific Utopia' বইটি পড়ছিলেন এবং বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় কোনো বিষয় নোট করছিলেন। কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি এখনও ঘুমোননি হরিয়েত্তনজী?' তখন তিনি ঘরের মধ্যে আমার উপস্থিতি অনুভব করলেন। আমাকে দেখে বললেন, 'এটি ড. রাওয়ের লেখা সর্বশেষ বই। ভাবছিলাম যে এই বইটি আজকের মধ্যে পড়ে শেষ করতে পারলে কাল এই বইটি পড়ার জন্য তোমাদের কাউকে দিতে পারতাম'। 'রাতের মধ্যে কি আপনার বইটা পড়া শেষ হবে?'— আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন— 'আর ১-২ ঘণ্টার মধ্যেই এই বইটি পড়া শেষ হবে'। তাঁকে দেখে যেন আপ্লুত হলাম! পরের দিন সকালে প্রাতরাশের সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, 'আমায় এই বইটি পড়তে নন্দন প্রথমে দেখার কারণে এই বইটি পড়ার প্রথম সুযোগ নন্দনকে দিচ্ছি। ও এটা পড়বে, নোট

সংগ্রহ করবে এবং তারপর বইটি আমায় ফেরত দেবে'।

একবার হরিয়েত্তনজী আমায় দত্তপন্থ ঠেংড়ীজীর লেখা— 'কমিউনিজম নিজেরই কষ্টিপাথরে' বইটি পড়ার জন্য দিয়েছিলেন। এই বইটির মধ্যে মতাদর্শ হিসেবে কমিউনিজমের মৌলিক ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহের ব্যাখ্যা ছিল। ড. রাওয়ের বইতেও কমিউনিজমের বিপদ সম্পর্কে বিশদ উল্লেখ ছিল। কমিউনিজম প্রসঙ্গে শ্রীগুরুজীর কথার উদ্ধৃতি হরিজী প্রায়শই দিতেন ও বলতেন— 'তাত্ত্বিকভাবে এটি ত্রুটিপূর্ণ, ভ্রান্ত এবং এর অনুশীলন ধ্বংসাত্মক!'

প্রগাঢ় একাগ্রতার সঙ্গে তাঁর অতি দ্রুত একটি বই পড়ে ফেলার মতো গুণের পরিচয় পাওয়ার মধ্যে দিয়ে হরিজীর মহত্ত্বের উপলব্ধি এরকম আরও একটি ঘটনায় হয়েছিল। সাপ্তাহিক কেশরী পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লেখার সময় একটি বইয়ের কথা আমার স্মরণে আসে। যে বইটি ১০-১২ বছর আগে আমি পড়েছিলাম। এই বইটিতে 'নব্য শ্রেণী' ('New Class') তত্ত্বের উপস্থাপনকারী একজন যুগোশ্লাভিয়ান কমিউনিস্ট পাঠকের প্রসঙ্গের উল্লেখ ছিল। তিরুবনন্তপুরম কার্যালয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বইটি না পেয়ে হরিয়েত্তনজীকে ফোন করি। তিনি বিচার কেন্দ্রম গ্রন্থাগারে আমায় যাওয়ার পরামর্শ দেন। কমিউনিজম বিষয়ক বইপত্রের বিভাগের কোন শেলফ্ নম্বরে বইটি পাওয়া যাবে এবং ওই বইয়ের কোন পৃষ্ঠায় এই New Class থিয়োরির উল্লেখ আছে সেটিও বলে দেন। সেখানে গিয়ে দেখি তাঁর কথাই সত্যি। কম্পিউটারকেও হার মানানোর সমান তাঁর এই প্রখর স্মরণশক্তিতে বিমুগ্ধ হয়ে যাই। শেষ পর্যন্ত ওই নামটি খুঁজে পাই— 'মিলোভান জিলাস' (Milovan Djilas)। সেই মূহূর্তে তাঁর থেকে দূরে থাকার কারণে মনে মনে তাঁকে আভূমি প্রণতি জ্ঞাপন করি।

অখিল ভারতীয় পরিবার

অখিল ভারতীয় দায়িত্ব পালনে কেরল থেকে বেরিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণের সময়, স্থান-বয়স-পেশা নির্বিশেষে সকল স্বয়ংসেবক ও তাদের পরিবারকে রঙ্গা হরিজীর বিষয়ে জানবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতে দেখেছি। প্রতিটি ব্যক্তিকেই নিত্যনতুন কিছু না কিছু দেওয়ার মতো চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন রঙ্গা হরিজী। তা সে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা সম্পর্কিত কোনো কঠিন প্রশ্নের উত্তর, বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য সঙ্ঘ কাজের লক্ষ্যে প্রেরণামূলক অন্তর্দৃষ্টি বা মহিলাদের জন্য বিভিন্ন খাবার তৈরির রন্ধন প্রণালী (রেসিপি)। পুরো ভারত জুড়ে সঙ্ঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবারসমূহে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ ছিল তাঁর সারল্য এবং প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর স্নেহের বন্ধন। প্রতিটি সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে সঙ্ঘের অধিকারীদের সঙ্গে 'ময়দানি গপশপ' নামক গুরুত্বপূর্ণ, আনুষ্ঠানিকতা-রহিত কার্যক্রম আয়োজিত হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ ও আলোচনার সুযোগলাভ করে এবং এইভাবে তাঁদের আত্মিক বন্ধন হয়ে ওঠে সুদৃঢ়। সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের নাম ও পরিচয় সেখানে অগ্রিম ঘোষিত হয় এবং স্বয়ংসেবকরা নির্দিষ্ট কার্যকর্তাদের সঙ্গে আলোচনাচক্রে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। একবার নাগপুরে থাকাকালীন সঙ্ঘের তদানীন্তন মাননীয় সহ-সরকার্যবাহ সুরেশ রাও কেতকরজীর ঘোষণা শোনার সৌভাগ্য হলো। তিনি বলেছিলেন— 'রঙ্গা হরিজী এখানে উপস্থিত থাকলে অন্য অধিকারীদের সঙ্গে আলোচনায় যোগদানে কেউ কি উৎসাহিত হবে?'

ধরিত্রীদেবীর বন্দনা

তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা, অনুসন্ধিৎসা ও অর্জিত জ্ঞান বিতরণের সংকল্প ছিল অতুলনীয়। শয্যাশায়ী অবস্থাতেও অব্যাহত ছিল তাঁর জ্ঞানসাধনা। ক্যানসার আক্রান্ত অবস্থায় অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যেই তাঁর রচিত শেষ গ্রন্থ— 'Prithvi-Sukta --- An Ode to Mother Earth'। দিল্লিতে তাঁর এই বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হরিজীর সঙ্গে হওয়া কথাবার্তা, নীরব থাকাকালীন মুক্তোর মতো তাঁর সেই হাসি— স্মৃতির পাতায় অমলিন হয়ে থাকবে। ১২ খণ্ডে সংকলিত হিন্দি 'শ্রীগুরুজী সমগ্র'— হরিয়েত্তনজীর অনন্য অবদানসমূহের অন্যতম। নাগপুরে সঙ্ঘের মুখ্য কার্যালয়ের সুব্যবস্থিত কার্যপ্রণালীও তাঁর বিরামহীন সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

হরিজীর অনুসন্ধিৎসা, তাঁর অসাধারণ লেখনশৈলী এবং নেতৃত্বদানের দক্ষতা এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত তাঁর অন্য দু'জন সহকর্মী প্রচারক— কিশোর কান্তজী ও কৃষ্ণকুমার বাওয়েজাজী বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করেন। 'শ্রী গুরুজী সমগ্র' হিন্দিতে প্রকাশের পাশাপাশি সব ভারতীয় ভাষায় প্রকাশের বিষয়ে হরিজী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হরিজীর উদ্যোগে ও নেতৃত্বে ১২টি খণ্ডে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এই বইটির হিন্দি সংস্করণ কেরালা-সহ ভারতের প্রতিটি রাজ্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পৌঁছয়। বইটি মালয়ালম ভাষায় অনূদিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্বের দরুন হরিজী হতাশ ও বিষণ্ণ হয়েছিলেন। এই কারণে তিনি কোচিতে গিয়ে প্রান্ত কার্যকর্তাদের ডেকে পাঠিয়ে এই প্রকল্পটির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন। অনন্য স্বভাবগত পদ্ধতিতে এই অনুবাদ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে তিনি সবাইকে নির্দেশিকাসমূহ দেন এবং এই অনুবাদ প্রকল্পের প্রধান দায়িত্ব

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

আমার কাঁধে অর্পণ করেন। এই প্রকল্পের কাজে আমাদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি কোচিতে প্রবাসকালে তিনি সব সময় আমাদের পাশে থাকতেন এবং আমাদের কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। হৃদযন্ত্রের সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হলেও তিনি তাঁর কর্তব্যের পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। সুধীন্দ্র মেডিক্যাল মিশন রুমের সেই দিন-রাতগুলি আমার স্মৃতির পাতায় জ্বলজ্বল করে যখন তাঁর সঙ্গে আমার থাকার সুযোগ হয়। শয্যাশায়ী পরিস্থিতিতেও তিনি সেই মালয়ালম অনুবাদ পড়ছিলেন ও সংশোধন করছিলেন।

তিনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরন্তর প্রয়াসই হলো সব সাফল্যের চাবিকাঠি। নির্দিষ্ট সংকল্প ও সেই অনুরূপ কার্যাবলী দ্বারা পরিচালিত না হলে দৈবকৃপা ভিক্ষা বা তা লাভের প্রত্যাশা কোনোভাবেই ফলপ্রদায়ক নয়। এই দৃঢ় প্রত্যয়ের নিদর্শন রূপে তিনি কবি লংফেলো (Longfellow)-র একটি কবিতা থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি দিতেন—

'The height by great men reached and kept
Were not attained by a sudden flight,
But they, while their companions slept,
Were toiling upward in the night.'

(মহান মানুষেরা যে উচ্চতায় পৌঁছন এবং তা ধরে রাখেন, তা হঠাৎ করে দ্রুতগতিতে আসে না। যখন তাদের সঙ্গীরা ঘুমিয়ে থাকে, তখন তাঁরা গভীর রাতে সকলের অলক্ষ্যে ক্রমোন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন)

কবিতার এই শব্দগুলি যেন প্রতিটি স্বয়ংসেবকের অন্তর্নিহিত চালিকাশক্তি। এহেন মতাদর্শপ্রেরিত হওয়ার দরুন অহরহ দেখতে ও শুনতে পাওয়া পুরনো ঘটনাবলীর প্রসঙ্গসমূহ হরিয়েত্তনজীর লেখনীতে উল্লেখিত হয়নি। ছাত্রাবস্থায় শ্রী গুরুজীর হাতে গ্র্যানাইটের স্তর ভাঙা পড়া বা হিমালয়ে পরিব্রাজনরত একজন সন্ন্যাসীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শ্রী গুরুজীর চারপাশের পরিমণ্ডলে অলৌকিক নীলাভ আলোক প্রভা দেখতে পাওয়ার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কোনো উল্লেখ হরিজী রচিত শ্রীগুরুজীর জীবনীতে পাওয়া যায় না। তাঁর চিন্তাধারায় শ্রীগুরুজী একজন ঐশীশক্তিসম্পন্ন, দিব্যপুরুষ হলেও, সেই ধারণা লেখনীর মাধ্যমে প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না হরিজী। যেহেতু শ্রীগুরুজীর জীবন পুরোপুরি একটি পথনির্দেশ, যে পথে সাধারণ মানুষ বিশেষত স্বয়ংসেবকদের অগ্রসর হওয়া কাম্য; হরিজী সেহেতু মনে করতেন লেখনীর মাধ্যমে ভিন্ন ধারণা প্রচারিত হলে শ্রীগুরুজী দূর থেকে পূজিত এক দেবমূর্তিতে পর্যবসিত হবেন। হরিজী বলতেন— 'অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রয়াসের মাধ্যমেই শ্রীগুরুজী শীর্ষস্তরে পৌঁছেছেন এবং আমাদেরও উচিত সেই পথে অবিচল থাকা, সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আমাদের কি সেই জীবনদর্শন পাঠককুল বিশেষত স্বয়ংসেবকদের সামনে তুলে ধরা উচিত নয়?'

হরিজীর ডেস্কের ওপরে একটি পুরনো কাগজগুচ্ছ পাওয়া যায়। আজও জানা যায় না কাগজের এই বান্ডিলটি কীভাবে সেখানে এল বা কে রেখে গেল। এ যেন এক রহস্য! পূজনীয় অখণ্ডানন্দজী মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্তির পর শ্রীগুরুজীর অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিশদ বর্ণনা এই কাগজগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। পড়লে মনে হয় এ যেন শ্রী গুরুজীরই স্বহস্তে রচিত বিবরণ। হরিজীর স্থানে আমি হলে এই ঘটনাকে হয়তো তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত বর হিসেবেই মনে করতাম। কিন্তু হরিজী কোনও দিন এই ঘটনার কোনও অতিপ্রাকৃতিক, অস্বাভাবিক বা অলৌকিক ব্যাখ্যা করেননি। এই ঘটনা জীবনাদর্শের প্রতি হরিজীর প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচায়ক।

তপস্যার উদ্দেশ্য

যখন তাঁর স্বাস্থ্যের ভগ্নদশা তখন একটি অখিল ভারতীয় কর্মশালায় 'রাষ্ট্রের স্বত্ব' ('Selfhood of Nation') শীর্ষক একটি বিষয় উপস্থাপনা প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য সঙ্ঘের দ্বারা চালিত একটি বালিকা সদনে) যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করি। সেখানে রঙ্গাহরিজী অবস্থান করছিলেন কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। আমার সদা স্নেহশীল গুরু অনুমতি দিলেন। কোচিন বিমানবন্দর থেকে সেখানে পৌঁছনোর ব্যাপারে আমার জন্য তিনি বালিকা সদনের ভারপ্রাপ্ত কার্যকর্তাকে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করতেও বলেন। মধ্যরাতে সেখানে পৌঁছে দেখি তিনি আমার থাকা-খাওয়া সহ সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। চোখের কোণ থেকে নেমে এলো অশ্রুধারা! ৪০ বছর আগে, সেই চিঠিতে তিনি আমায় লিখেছিলেন— 'প্রেম ও স্নেহের সহিত আমার প্রিয় নন্দনের প্রতি'। তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে উৎসারিত সেই বাণী এই প্রখর জীবনতাপে আমার জীবনে যেন বয়ে আনে এক পলক স্নিগ্ধ, শীতল সমীরণের পরশ!

পৃথ্বী সূক্তের ভাষ্য প্রকাশের সময় পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত হরিজীর প্রসঙ্গে আলোচনাক্রমে বলেন, 'আমরা যখন তাঁর পাশে বসি, তখন তাঁর জ্ঞানের গভীরতা অনুমানের ক্ষমতা কারুর নেই। কিন্তু তিনি তাঁর কথা শুরু করলে, তাঁর জ্ঞান সবার মধ্যে প্রবেশ করে এবং সর্বত্র বিস্তৃত হতে থাকে। মোহনজীর কথায়--- 'এ যেন বৃষ্টিস্নাত হওয়া। না চাইলেও অজান্তেই যেন সেই পবিত্র বৃষ্টিধারায় স্নাত হওয়া। এবং এই বারিধারা যেন চলে অবিরত, অবিশ্রান্ত। বৃষ্টিভেজা না হতে আপনি সেই ঝরনাধারার মাঝে একটি ছাতা ধরতেই পারেন। কিন্তু সেই অবিরাম বর্ষণ আপনাকে সিক্ত করবেই। বর্ষণসিক্ত হওয়া ছাড়া এক্ষেত্রে আপনি সম্পূর্ণ নিরুপায়। এটিই হরিজীর--- জ্ঞানবর্ষী ঝরনাধারা। এই বৃষ্টি হলো জ্ঞানের শাশ্বতধারা'।

এই জ্ঞানপ্রদায়িনী অমৃতধারা হয়ে উঠুক আমাদের চিরন্তন পথপ্রদর্শক। আমার গুরু— হরিয়েত্তনজীর পবিত্র স্মৃতির প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণতি।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা রাষ্ট্রীয় সংযোজক, প্রজ্ঞাপ্রবাহ)

সন্ত্রাসীরাই সন্ত্রাসবাদের বড়ো সমর্থক

মণীন্দ্রনাথ সাহা

৩০-৩৫ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সম্পর্কে একটা কথা খুব চালু ছিল। সেটি হলো 'কায়রোতে কাক মরলে কলকাতাতে মিছিল করে।' এই কথাটা যে অবান্তর নয় তার ভুরি ভুরি প্রমাণ রেখেছে সিপিএম এই পশ্চিমবঙ্গে। যেমন, ইরাকে সাদ্দাম হুসেনের ওপর আমেরিকার আক্রমণ, আফগানিস্তানে তালিবানকে আমেরিকার শিক্ষা দেওয়ার সময়, ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ভিয়েতনামিদের পক্ষে এদের সমর্থন ছিল চোখে পড়ার মতো। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় এরা যে স্লোগান দিত তা শুনে মানুষ হেসে গড়াগড়ি যেত। তাদের স্লোগান ছিল— 'তোমার আমার বাপের নাম, ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম', 'ভুলতে পারি বাপের নাম, ভুলবো নাকো ভিয়েতনাম।'

দুটিমাত্র দেশ চীন ও রাশিয়া ছাড়া বিশ্বে যে কোনো দেশে সন্ত্রাসী মুসলমানদের ওপর সেদেশের সরকার বা অন্য জনগোষ্ঠীর আক্রমণ হলে এরা কালক্ষেপ না করে কলকাতার জনজীবন স্তব্ধ করে মিছিল বের করে। আর দেশের মধ্যে কোথাও যদি মুসলমানের গায়ে হাত পড়ে তাহলে তো কথায় নেই। নাওয়া খাওয়া ভুলে চিল চিৎকার শুরু করবে, তা তারা যতই অপরাধ করুক না কেন।

সম্প্রতি কলকাতায় প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের কঠোর প্রত্যাঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করেছে সিপিএম-সহ একাধিক বাম সংগঠন। সিপিএম-সহ বাম দলগুলির দাবি, প্যালেস্তাইনে গণহত্যা চালাচ্ছে ইজরায়েল বাহিনী। তারা দাবি করেছে, গাজায় ইজরায়েলের গণহত্যা বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে হবে এবং গাজায় পর্যাপ্ত মানবিক ও জীবনদায়ী ওষুধ-সহ অন্যান্য সাহায্য পাঠাতে হবে। সিপিএমের এই দাবিকেই বহু মানুষ ভণ্ডামি বলছেন। কেন ভণ্ডামি বলছেন সেটাও একটু দেখে নেওয়া যাক। সিপিএমের জ্যাঠামশাই চীন সেদেশের জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসরত মুসলমানদের যে কী হাল করেছে সে খবর এখন আর কারও জানতে বাকি নেই। চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিঙের নির্দেশে সেদেশের মুসলমানদের নামাজ পড়া বন্ধ, দাড়ি রাখা অপরাধ, আরবি নাম রাখা, ইসলামি সাহিত্য পড়া চলবে না।

এছাড়া আরও বহু বাধা নিষেধের মাধ্যমে সেখানে মুসলমানদের নরকযন্ত্রণা নামিয়ে এনেছে। কিন্তু এদেশের সিপিএম এবং অন্য বাম দলগুলির এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ নেই। আবার এদের প্রপিতামহ রাশিয়া সেদেশের মুসলমানদের প্রতি এতটা নির্দয় না হলেও কয়েক বছর আগে রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন মোলায়েম ভাষায় মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তারা রাশিয়ায় রাশিয়ানদের মতো বসবাস করুক। যে সমস্ত সংখ্যালঘু যে কোনো স্থান থেকে রাশিয়ায় এসে বসবাস করতে চায়, কাজ করতে চায়, রাশিয়ায় খেতে চায়, তাহলে রুশভাষায় কথা বলতে হবে, রাশিয়ান আইনকে সম্মান জানাতে হবে এবং যদি ইসলামি জীবনযাপন করতে চায় তাহলে তাদের উপদেশ দেব, তারা যেন সেই দেশে চলে যায় যে দেশের আইন তাদের অনুকূলে।' এক্ষেত্রেও বাম দলগুলির কোনো প্রতিবাদ মিছিল এ রাজ্যের কোথাও দেখা যায়নি।

> বামপন্থীরা যারা আজ প্যালেস্তাইনের জন্য রাস্তায় নেমেছেন, তাঁরা কিংবা তাঁদের পূর্বসূরিরা পশ্চিমবঙ্গে বা বাংলাদেশে হিন্দু হত্যার প্রতিবাদে একবারের জন্যেও পথে নেমেছেন? না, নামেননি। কারণ আপনারা মনে করেন, মুসলমান ভোটব্যাংকের মূল্য হিন্দুদের থেকে বেশি।

এখন প্রশ্ন হলো, গাজায় ইজরায়েল প্রত্যাঘাত চালাচ্ছে কেন? এর সহজ উত্তর ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের মানুষ উৎসবে আনন্দ করার সময় তাদের ওপর প্যালেস্তাইনি জঙ্গি হামাস বিনা প্ররোচনায় জল, স্থল, আকাশ পথে প্রায় চার হাজার রকেট নিক্ষেপ করে নারী শিশু-সহ হাজারে হাজারে ইহুদি হত্যা শুরু করেছে। কী অপরাধ ছিল ইহুদিদের? তারা যখন প্রত্যাঘাত শুরু করেছে তখন এত চিৎকার কেন? এর কোনো সদুত্তর এদের কাছে পাওয়া যাবে না।

আবার কলকাতা থেকে গাজা-প্যালেস্তাইন কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে। সিপিএমের এইসব চার আনা, আট আনা, বারো আনার নেতারা

কোনওদিন সেই দেশ চোখে দেখেননি। সেই দেশ আলাদা, অধিবাসী আলাদা, দেখতে আলাদা, রহন-সহন আলাদা, ভাষা আলাদা, খাদ্যাভ্যাসও আলাদা। তবে তাদের জন্য আর্তচিৎকারে আমাদের পাড়ার কমরেডদের গলার শিরা ফুলে উঠছে কেন? একবার প্রশ্ন করে দেখবেন— রকেটের গতিতে উত্তর ধেয়ে আসবে, মানবতা, বিশ্বভ্রাতৃত্বের কারণে। সেই বাঁধা ছক, ভাঙা রেকর্ড— বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত, অত্যাচারিত, শোষিত, বঞ্চিত, মেহনতি মানুষের পাশে কমিউনিস্টরা চিরকাল থেকেছেন, তাই আমাদের এই প্রতিবাদ।

কিন্তু কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার রাস্তা সীমান্তের ওপারে থাকা বাংলাদেশ, যেখানে একপুরুষ আগেও আপনাদের কমরেড জ্যোতি, অনিল, বুদ্ধ, বিকাশবাবুদের বাবা-ঠাকুরদারা বাস করতেন, সেই বাংলাদেশে আগের হিসাব বাদ দিয়েও ২০২১ সালে যখন দুর্গাপূজার সময় নির্বিচারে হিন্দুনিধন শুরু হলো, মা-বোনেদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হলো, মন্দির, পূজামণ্ডপ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো, তখন কি তার প্রতিবাদ আপনারা করেছিলেন? সেদিন আপনাদের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ কোথায় ছিল?

এতো গেল প্রতিবেশী দেশের কথা। একবার দেশের ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এই ভারতের এক অঙ্গরাজ্যে কমরেডরা অফিসের ক'দিনের ছুটি পেলেই বউ-বাচ্চা নিয়ে একঘেয়েমি কাটাতে যেখানে ছুটে যেতেন, সেই কাশ্মীরের কথা বলছি। নব্বইয়ের দশকে তৎকালীন শাসকের মদতে সেই কাশ্মীরের ভূমিপুত্র হিন্দু পণ্ডিতদের যখন জেহাদিরা গণহত্যা করল, নারী ধর্ষণ করল, তাদের জন্মভূমি থেকে তাড়িয়ে দিল, নিজের দেশেই শরণার্থী বানিয়ে ছাড়ল, তখন আপনারা কি একবারের জন্যও প্রতিবাদ করেছিলেন? না, করেননি।

এছাড়া মনে পড়ে কমরেড আপনাদের সেই সমস্ত কীর্তিকলাপের কথা— ১৯৭০ সালে বর্ধমান শহরে সাঁইবাড়ির কথা? শুধুমাত্র কংগ্রেস দলের কর্মী হওয়ার অপরাধে একই বাড়ির দুইভাই এবং বাড়ির গৃহশিক্ষককে হত্যা করে মৃত ছেলের রক্ত দিয়ে ভাত মেখে মাকে জোর করে খাইয়ে দিয়েছিল আপনাদের কমরেড নিরূপম সেন, বিনয় কোঙার, অনিল বসু, মদন ঘোষ এবং আরও কয়েকজন মিলে।

এছাড়া ১৯৭১ সালে কাশীপুর-বরানগরের গণহত্যার কথা? নকশালদের বুলেটিন 'ফ্রন্টিয়ার'-এ লেখা হয়েছিল— শুক্র ও শনিবার এই দু'দিনের মধ্যে ১৫০ জনেরও বেশি তরুণকে খুন করা হয়। যাঁরা তরুণ নয় তাঁদেরও মরতে হয়।

ফিরে দেখুন ১৯৭৭ সালে। এই পশ্চিমবঙ্গে আপনারা শাসনক্ষমতা দখল করার পর কীভাবে সংগঠিত হত্যালীলা চালিয়েছিল আপনাদের হার্মাদ বাহিনী পুলিশ ও প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে। ১৯৭৯ সালে মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের উৎখাতের নামে কতজনকে হত্যা করেছিলেন তার কোনো সঠিক হিসেব মেলেনি। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে কয়েক হাজার শিশু-সহ নারী পুরুষকে হত্যা করা হয়েছিল।

১৯৮২ সালে কসবার বিজন সেতুতে আনন্দমার্গের ১৭ জন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীকে লাঠি, রড দিয়ে পিটিয়ে তাঁদের গায়ে কেরোসিন, পেট্রোল ঢেলে তাঁদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। আহত হয়ে কোনোরকমে প্রাণে বেঁচেছিলেন আরও ১৮ জন। এক্ষেত্রেও অভিযোগের তির ছিল সিপিএমের দিকে।

বিজনসেতুর পর ১৯৯০ সালের ৩০ মে বানতলায়, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই ধর্মতলায়, ২০০০ সালের ২৭ জুলাই সূচপুরে, ২০০১ সালের ৪ জানুয়ারি ছোটো আঙারিয়া, ২০০৬ সালের ২৬ মে সিঙ্গুরে, ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে, ২০০৮ সালের ১৩, ১৪, ১৫ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে, ২০১১ সালে ৭ জানুয়ারি নেতাই প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত গণহত্যা ঘটেছে তা কিন্তু সিপিএম দল এবং বামফ্রন্ট সরকারের সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। না, এটা আমার কোনো মনগড়া কথা নয়। ওই সমস্ত ঘটনার কথা খবরের কাগজের পাতা ওলটালেই জানা যাবে। আর সমস্ত ঘটনা ঘটানো হয়েছে হিন্দুদের শায়েস্তা করার জন্য।

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির পটপরিবর্তন হলেও সরকার এবং দলের প্রচ্ছন্ন মদতে তৃণমূলের দুধেল গাইদের দ্বারা নির্যাতিত, নীপিড়িত, নিহত, উৎপীড়িত ও ধর্ষিতা হয়েছে অগণিত হিন্দু নর-নারী ও শিশু। সর্বস্বান্ত হয়ে শয়ে শয়ে মানুষকে বাড়িছাড়া, গ্রামছাড়া, এমনকী রাজ্যছাড়া হতে হয়েছে। বামফ্রন্ট আমলের ঘটনায় কিংবা তৃণমূলের আমলের এই সমস্ত ঘটনায় কোথাও, কখনও কি বামপন্থীরা যারা আজ প্যালেস্তাইনের জন্য রাস্তায় নেমেছেন, তাঁরা কিংবা তাঁদের পূর্বসূরিরা পশ্চিমবঙ্গে বা বাংলাদেশে হিন্দু হত্যার প্রতিবাদে একবারের জন্যেও পথে নেমেছেন? না, নামেননি। কারণ আপনারা মনে করেন, মুসলমান ভোটব্যাংকের মূল্য হিন্দুদের থেকে বেশি।

সব চাইতে বড়ো কথা, আপনারা নিজেরাই সন্ত্রাসী আর তাই সন্ত্রাসবাদের আপনারা বড়ো সমর্থক।

মনে রাখবেন, রাজ্যের ভোটাররা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এক ভাগ দুধেল গাই যারা সম্পূর্ণ তৃণমূলের হস্তগত আর একদল সীমাহীন ধৈর্যের প্রতীক হিন্দুরা যারা দেশের কিছু রাজনীতিকদের দ্বারা নির্যাতিত, তারা এখন বিজেপির সমর্থক। আপনারা যতই হামাস সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে গলা ফাটান না কেন ২০২৪-এর লক্ষ্যে, আপনাদের ভাগ্যে শুধুই হা-হুতাশ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। আপনাদের জন্মলগ্ন থেকে আপনারা এদেশের হিন্দুদের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন, তার মাশুল আপনাদের দিতেই হবে। □

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে তুলনামূলক ভাবে দেশে কর্মসংস্থান অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে

আনন্দ মোহন দাস

যে কোনো দেশের আর্থিক উন্নতির একটি অন্যতম মাপকাঠি হলো বেকারত্ব দূরীকরণ। মানুষের কর্মসংস্থান না থাকলে আর্থিক প্রগতির সুফল তাদের কাছে পৌঁছায় না। সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই শাসকবিরোধী দলগুলি এই অস্ত্রকে হাতিয়ার করে শাসক দলকে সর্বদা বিড়ম্বনায় ফেলে। যদিও আমাদের দেশের বিরোধীদলগুলি বেকারত্বের পরিমাণ নির্ধারণে বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যানে আস্থা রাখে না। সেজন্য এরা চোখ কান বুজে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নেতিবাচক ছবি তুলে ধরতে সচেষ্ট থাকে। আর নির্বাচন থাকলে এই প্রচেষ্টা আরও দ্বিগুণ মাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং দেশে আর্থিক উন্নয়নের কথা স্বীকার করে না। সেরকমই হলো বিরোধীদের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বেকারত্ব বৃদ্ধির ভিত্তিহীন অভিযোগ যা নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানগত তথ্য থেকে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আজকের বিশ্লেষণে সরকারি ও বেসরকারি দুটি পরিসংখ্যান নিয়েই তুলনামূলক আলোচনা থাকবে। ভারতীয় অর্থনীতির সাফল্যের অন্যতম দিকটি হলো বেকারত্বের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হওয়া।

গত কয়েক বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ভারতীয় অর্থনীতিতে বেকারত্বের হার হ্রাস পেয়েছে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বলেছেন যে, সংখ্যা ও গুণগত মানের দিক থেকে ভারতের কর্মসংস্থান দেশের আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যারা অন্য দাবি করছেন, তারা হয় ভুল তথ্যের ভিত্তিতে বলছেন বা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে তথ্য ভুল পড়ছেন। আগামী নির্বাচনগুলিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলো বেকারত্বের ভুল চিত্র তুলে ধরে ভোটের বাক্স ভরার মিথ্যা কৌশল নিয়ে চলেছে। সেজন্য কেন্দ্রের শাসকদলের কর্মসংস্থানের প্রকৃত চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরা উচিত। আমাদের দেশে কর্মসংস্থান নিয়ে সর্বদা কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দল ও সরকার বিরোধী তথাকথিত কিছু অর্থনীতিবিদ বেসরকারি তথ্য (CMIE) ব্যবহার করে তীব্র বিতর্ক করে চলেছেন এবং ভুল ন্যারেটিভ তৈরি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। আমাদের দেশে এ বিষয়ে সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যানগত তথ্য প্রদানকারী দুটি মাধ্যম রয়েছে যা আন্তর্জাতিক স্তরেও স্বীকৃতি রয়েছে। একটি হলো National Sample Survey Office (NSSO) এবং অন্যটি Periodic Labour force Survey (PLFS) Data. বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়েছে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারলেও বেসরকারি তথ্য (CMIE) অনুযায়ী দেখা যায় কোভিড-১৯ মহামারীর আগে দেশে রোজগারের পরিমাণ ও গুণগত মান দুই দিক থেকেই বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিক বছর ২০১৭-১৮ থেকে ২০১৯-২০ বর্ষে নিয়মিত বেতনভুক্ত কর্মচারীদের সংখ্যা দেড় কোটি বেড়েছে যা শতাংশের হিসেবে ১৩.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলা কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৯.৪০ শতাংশ এবং পুরুষ কর্মীদের সংখ্যা ৮.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া চিরাচরিত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে ২৯.৪০ শতাংশ এবং পুরুষ কর্মীদের সংখ্যা ৮.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া চিরাচরিত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয়েছে ১ কোটি ২০ লক্ষের

MORE JOBS, BETTER JOBS

Increase In Quantity & Quality Of Employment (Rural + Urban)

Employment Metric	2017-18	2019-20	2022-23
QUALITY OF EMPLOYMENT (IN CRORE)			
Regular Wage/ Salaried Employees	11.5	13	14.3
Formal Employment	4.7	5.9	6.3
QUANTITY OF EMPLOYMENT (IN %)			
Labour Force Participation Rate	49.8	53.5	57.9
Worker-Population Ratio	46.8	50.9	56.0
Unemployment Rate	6.0	4.8	3.2

Urban Unemployment Rate (%) (Quarterly PLFS Data)

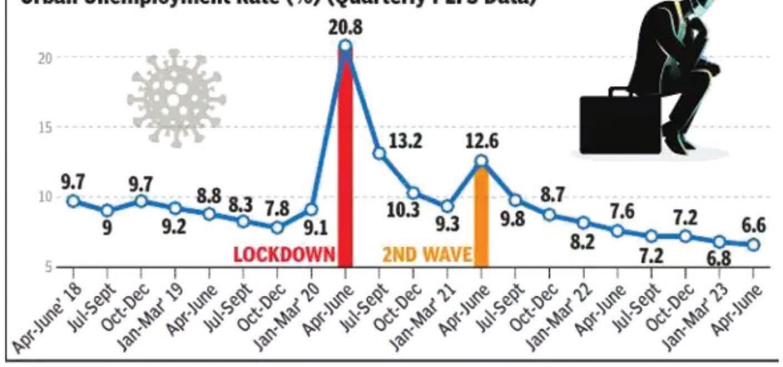

মতো বা ২৫.৩ শতাংশ। কোভিডের আগে কর্মসংস্থান যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে সেরকম বেকারত্বের হারও হ্রাস পেয়েছে। আর্থিক বছর ২০১৭-১৮ থেকে ২০১৯-২০-তে দীর্ঘকালীন বেকারত্ব ৬ শতাংশ থেকে কমে ৪.৮ শতাংশ হয়েছে। রোজগার ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণকারীদের হার (LFPR) বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯.৮০ শতাংশ থেকে ৫৩.৯০ শতাংশ হয়েছে। এই পরিবর্তন গ্রামীণ ও শহর এলাকায় পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে।

দ্বিতীয়ত, তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা গেছে লকডাউনের সময় এবং মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রতিকূল প্রভাব থাকা সত্ত্বেও কোভিড মহামারীর পর শহর এলাকায় কর্মসংস্থান পুনরুদ্ধার হয়ে ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০১৯ সালের ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২০২৩ সালের জুন ত্রৈমাসিকে দেখা যায় জনসংখ্যার অনুপাতে কর্মীর সংখ্যা ৪৪.১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৫.৫ শতাংশ হয়েছে। শ্রমশক্তির যোগদানের হার (LFPR) ৪৭.৮০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮.৮ শতাংশ হয়েছে। বেকারত্বের হার ৭.৮০ শতাংশ থেকে কমে ৬.৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। করোনা মহামারীর সময় কর্মসংস্থানের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শহর এলাকা যা পরবর্তীকালে সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু গত জুন ত্রৈমাসিকে দেখা যায় বেকারত্বের হার বিগত পাঁচ বছরের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে। অনেক দেশ এখনও করোনা মহামারীর ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। সে তুলনায় ভারতের অর্থনীতি অনেক মজবুত স্থানে অবস্থান করছে।

পরিসংখ্যানে দেখা যায় করোনা মহামারীর পরবর্তীতে গ্রামীণ ও শহর এলাকায় সম্পূর্ণভাবে কর্মসংস্থান পুনরুদ্ধার হয়েছে। এই লক্ষণ মনরেগা (MGNREGS) ও কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংস্থার (EPFO) রিপোর্টেও প্রতিফলন ঘটেছে। EPFO তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ২০২২ সালের ডিসেম্বরে কাজের চাহিদার পরিমাণ অর্ধেক

> **কোভিড মহামারীর ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হয়েও বিশ্বের যে কোনো দেশের চেয়ে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও ভারতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে।**

ছিল। ২০২৩ সালে সংখ্যাটি আরও হ্রাস পেয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় গ্রামীণ এলাকায় মনরেগার অধীনে শ্রমসাধ্য কাজের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে।

পরিসংখ্যানে দেখা যায় করোনা মহামারীর আগের তুলনায় বর্তমান কর্মসংস্থানের পরিমাণ ও গুণগত মানের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। দৈনিক ও বেতনভুক্ত কর্মচারীদের সংখ্যা ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের তুলনায় (১১.৫০ কোটি) ২.৮০ কোটি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ সালে তা ১৪.৩০ কোটি হয়েছে। চিরাচরিত কর্মসংস্থান ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের তুলনায় ২০২২-২৩ সালে ১.৬০ কোটি বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৭০ কোটি থেকে ৬.৩০ কোটি হয়েছে। করোনা মহামারীর মতো ভয়ংকর ধাক্কা সামলেও এই ধরনের ফলাফল ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহজনক।

উপরিউক্ত পরিসংখ্যানে বোঝা যায় কর্মসংস্থানের বিষয়ে বিরোধীদের ন্যারেটিভগুলি তথ্যনির্ভর ও প্রামাণিক নয়। তাঁরা ভুল তথ্য পরিবেশন করে মানুষকে ঠকাচ্ছেন। প্রথমত, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) নিয়ম অনুযায়ী রোজগারের সংজ্ঞা হলো যে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তা মার্কেট ইউনিটে হোক, নন মার্কেট ইউনিটে হোক বা নিজেদের ব্যবহারের জন্য গৃহে উৎপন্ন কোনো পণ্য ও সেবা (goods and services) হোক না কেন, তাকেই কর্মসংস্থান হিসেবে ধরা হয়। এক্ষেত্রে সংজ্ঞা অনুযায়ী কাজের পরিধি অনেকটাই ব্যাপক অর্থে ধরা হয়।

কিন্তু PLFS সমীক্ষা অনুযায়ী রোজগারের মাপদণ্ড বা সীমারেখা তুলনায় অনেকটাই সংকুচিত। যার ফলে ILO সংজ্ঞা অনুযায়ী কর্মসংস্থান ও বেকারত্বের হারের চেয়ে, PLFS সমীক্ষা অনুযায়ী বেকারত্বের হার অনেক বেশি দেখায় এবং কর্মসংস্থান কম দেখায়। তা সত্ত্বেও বর্তমান তথ্য অনুযায়ী তুলনামূলক ভাবে দেশে বেকারত্বের হার কম এবং কর্মসংস্থানের হার ভালো যা ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে খুবই শুভ।

দ্বিতীয়ত, PLFS সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গেছে, করোনায় লকডাউনের সময় বেকারত্বের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি ছিল এবং কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে তা মাঝারি বৃদ্ধি পেয়ে প্রমাণিত হয়, PLFS সমীক্ষা রিপোর্ট ভারতের কর্মসংস্থানের অবস্থার সঠিক ও বাস্তব চিত্র তুলে ধরে।

সুতরাং একথা বলাই যায়, কোভিড মহামারীর ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হয়েও বিশ্বের যে কোনো দেশের চেয়ে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও ভারতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। □

With Best Compliments from -

A Well Wisher

নিউজক্লিকের ঘটনায় কমিউনিস্টদের মুখোশ খুলে গিয়েছে

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

গত ৩ অক্টোবর সকালে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির নয়াদিল্লির বাড়িতে দিল্লি পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে। যে বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে সেটি ৩৬ নম্বর পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লা লেনে অবস্থিত। এই বাড়িটা সিপিএম দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ইয়েচুরির বাসস্থান। বাড়িটা বাম কৃষকসভা এবং সিপিএমের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের থাকার জন্যও ব্যবহৃত হয়। এই বাড়ির একটি তলায় থাকেন নিউজক্লিকের এক তরুণ সাংবাদিক। ঘটনা হলো যুবকের বাবা শ্রী নারায়ণ সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি দফতরে কাজ করেন। আর সেই সুযোগে ওই তরুণও এই বাড়িতে থাকেন। বহুদিন যাবৎ নিউজক্লিকের অনেক অপকর্মের খোঁজ মিলেছে। সে কারণে রাজধানীর অনেক জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে দিল্লি পুলিশ। ইয়েচুরির বাড়িতে ওই যুবকের খোঁজে তল্লাশিতে এসেছিল পুলিশ। যুবকের ল্যাপটপ ও মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেছে।

এই তল্লাশি প্রসঙ্গে ইয়েচুরি সাফাই দিয়ে বলেছেন, ''পুলিশ আমার বাড়িতে তল্লাশি করতে এসেছিল। কারণ ওই বাড়িতে দলীয় এক কর্মী থাকেন যাঁর পুত্র আবার নিউজক্লিকে কাজ করেন। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছিল। ওই কর্মীর পুত্রের ল্যাপটপ ও ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ওরা কীসের তল্লাশি চালাচ্ছে, কেন চালাচ্ছে, কেউ জানে না। যদি সংবাদমাধ্যমকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হয়, তা হলে দেশের মানুষের জানা উচিত, এর পিছনে কী কারণ রয়েছে।'' পলিটব্যুরো সদস্য নীলোৎপল বসু বলেন, ''বিভিন্ন মানুষের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে ওরা। সাংবাদিক, স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ানদের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। কী অভিযোগে তল্লাশি চালানো হচ্ছে স্পষ্ট নয়।'' কিন্তু এই ঘটনায় বামপন্থীদের দেশদ্রোহী ভূমিকার মুখোশ খুলে গিয়েছে।

নিউজক্লিক যে দেশবিরোধী এটা এখন জনসমক্ষে এসে গেছে। আর ঢেকে রাখা যাবে না। আর্থিক তছরুপ এবং চীনের হয়ে ভারতবিরোধী অপপ্রচার চালায় নিউজক্লিক। এই অভিযোগে নিউজক্লিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্ত ২০২১ সালে শুরু হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে নিউজক্লিক চীনপন্থী, ভারত-বিরোধী প্রচারের জন্য চীন থেকে তহবিল পায়।

বহুদিন যাবৎ নিউজক্লিক ও সহযোগী কিছু সংবাদসংস্থা দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই তা প্রতিরোধ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং এটা তাদের আবশ্যিক কর্তব্যও বটে। তারা তাই করছে।

দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল নিউজক্লিকের অনেক সাংবাদিকের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে কয়েক মাস আগে। এ বছর ১৭ আগস্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির 'অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ আইন' (ইউএপিএ)-এ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে নিউজক্লিকের বিরুদ্ধে। পুলিশের এক সূত্র জানিয়েছে ২ অক্টোবর স্পেশাল সেলের শীর্ষ আধিকারিকরা বৈঠকে বসেছিলেন; কী ভাবে, কোথায়, কখন তল্লাশি অভিযান চালানো হবে, তা নিয়ে আলোচনা হয় ওই বৈঠকে। পরিকল্পনা মতো ৩ অক্টোবর সকাল ৬টা থেকেই দিল্লি, নয়ডা, গাজিয়াবাদ, গুরুগ্রাম ও মুম্বইয়ে একশোর বেশি জায়গায় হানা দেওয়া হয়। সকাল থেকে এই সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে জড়িত বহু সাংবাদিক ও কর্মীর বাড়িতে তল্লাশি চালায় দিল্লি পুলিশ। এই তল্লাশি অভিযানে মোতায়েন করা হয়েছিল ৫০০ পুলিশ। এই অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু বৈদ্যুতিন গ্যাজেট, ফোন, হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর। বেশ কিছু সাংবাদিককে লোধি রোডের

স্পেশাল সেলের দফতরেও নিয়ে আসা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। নিউজক্লিকের বর্তমান ও প্রাক্তন সাংবাদিক, কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত অনেকের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তাঁদের মধ্যে আছেন অনুরাধা রমন, সত্যম তিওয়ারি, অদিতি নিগম, সুমেধা পাল-সহ আরও অনেকে।

সূত্রের খবর, যাঁদের বাড়ি তল্লাশি চালানো হয়েছে তাঁদের এ, বি, সি ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয়েছিল। 'এ' তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের আটক করা হয়েছে। চীনের অর্থে পরিচালিত নিউজক্লিকের সঙ্গে সংযুক্ত ৩০টি স্থানে অভিযান চালানোর পরে এবং ৪৩ জন কর্মচারীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করে দিল্লি পুলিশ নিউজক্লিকের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থ এবং সংস্থার মানবসম্পদ প্রধান অমিত চক্রবর্তীকে 'অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ আইনে' গ্রেপ্তার করেছে। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের দফতরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁদের নিয়ে আসা হয়েছে। পোর্টালের মাধ্যমে প্রাপ্ত অবৈধ বিদেশি তহবিলের তদন্তে নির্দিষ্ট তথ্য মেলার পরে অভিযান এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আবার জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত, বর্তমানে ভ্রষ্ট, পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ এখন চীনের অর্থায়নে নিউজক্লিকের সমর্থন করছে; তারা শুধু নকল মাওবাদী নয়, তারা জিহাদি তত্ত্বের সঙ্গেও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। ভারত সরকার জিহাদি সংগঠন পিএফআই নিষিদ্ধ করার পরে পিইউসিএল সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিল।

গ্রেপ্তারের পর বেশ কিছু বামপন্থী ও ইসলামপন্থী নিউজক্লিকের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে—তদন্তকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ বলে অভিহিত করেছে। মজার বিষয় হল, এই 'সাংবাদিকরা' যারা নিউজক্লিককে সমর্থন করছেন তাঁরা ভারতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর আক্রমণ সম্পর্কে একটা কথাও বলেনি, একটি বিদেশি বৈরী শক্তি জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য তথাকথিত সংবাদ মঞ্চকে অর্থায়ন করে এবং চীনপন্থী প্রচারে লিপ্ত হয় সে বিষয়ে তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

নিউজক্লিক এবং এর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তদন্তের পরে যে প্রচার চালানো হয়েছিল তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে, পিএফআই-এর মতো আরবান নকশাল, মাওবাদী ও জিহাদিদের সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থা দ্য পিপলস ফর সিভিল লিবার্টিজ চীনের অর্থায়নে প্রচারণার সমর্থনে বেরিয়ে এসেছে। 'দ্য হিন্দু'র প্রতিবেদন অনুসারে পিইউসিএল নেতা কবিতা শ্রীবাস্তব এবং ভি. সুরেশ নিউজক্লিক এবং অন্যান্য মিডিয়া পেশাদারদের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকদের অনুসন্ধানের নিন্দা করেছেন। দুঃখজনক যে পুলিশ 'অবৈধ কর্মকান্ড প্রতিরোধ আইনে'র কঠোর ১৩, ১৬, ১৭, ১৮ এবং ২২সি ধারায় সন্ত্রাসের মামলার তদন্ত করছে। মিডিয়া পেশাদারদের বিরুদ্ধে আইপিসির ১৫৩(ক) (ঘৃণাভাষণ) এবং ১২০(খ) (ষড়যন্ত্র) ধারাও দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে এই অভিযান এবং গ্রেপ্তারগুলো নিউজক্লিকের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের এক বৃহত্তর আক্রমণের অংশ। এই বিষয়ে জনমত প্রভাবিত করার জন্য দিল্লি হাইকোর্টে মামলাগুলো তালিকাভুক্ত হওয়ার এক সপ্তাহ আগে অভিযান ও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বামপন্থী নেতাদের বক্তব্য হলো, যেভাবে দিল্লি পুলিশ সাংবাদিকদের ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সমস্ত ডেটা বাজেয়াপ্ত করেছে তাদের ডেটার অখণ্ডতা নষ্ট হয়েছে; তাদের গোপনীয়তা এবং পরিচয় লঙ্ঘন করা হয়েছে। এটা গোপনীয়তার অধিকার, মর্যাদার অধিকার এবং সেইসঙ্গে সাংবাদিকদের নির্ভয়ে পেশা অনুশীলন করার স্বাধীনতার উপর মারাত্মক আক্রমণ।

পিইউসিএল হলো পিপলস ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস (PUDR) এর ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন। পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ-এর মাওবাদীদের সঙ্গে ব্যাপক সম্পর্ক রয়েছে। আরবান নকশাল যারা এলগার পরিষদের মামলায় এবং প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি কথিত হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিল তারা পিইউসিএলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পিইউসিএল এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলোর কাশ্মীরের পাশাপাশি মণিপুরের নকশাল এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে সম্পর্কের ইতিহাস রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সংগঠনের অসংখ্য সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভীমা কোরেগাঁওয়ে সহিংসতার সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে একজন পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ-এর ছত্তিশগড় ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক সুধা ভরদ্বাজ।

ফাদার স্ট্যান স্বামীও পিইউসিএল-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পিইউসিএল যে আখ্যান প্রচার করে তা কখনোই 'সুশীল সমাজ'-এর ধারণা একেবারেই মেলে না। সংগঠন ইসলামি সন্ত্রাসী আফজল গুরুর ফাঁসির নিন্দা জানিয়েছে। দিল্লি পিইউসিএল-এর ২০১৬-১৭- র রিপোর্ট অনুসারে, 'তাদের প্রতিবাদ করার অধিকার লঙ্ঘন এবং ৫ই নভেম্বর ২০১৭-এ দিল্লি পুলিশ কর্তৃক তাদের বাক স্বাধীনতা লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে' ইসলামপন্থী সংগঠন পিএফআই-কে তারা সহায়তা করেছিল। আরবান নকশাল বিনায়ক সেন রায়পুর দায়রা আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরেও পিইউসিএল-এর সহ-সভাপতি রয়ে গিয়েছিলেন। পিইউসিএল-এর পশ্চিমবঙ্গ ইউনিটও সেনকে তার সমস্ত অপরাধ থেকে অব্যাহতি দিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছে এবং তাকে 'রাষ্ট্রীয় নৃশংসতার শিকার' হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

সম্প্রতি সংগঠনটি এক নিবন্ধে গ্যাংস্টার আতিক আহমেদ ও তার শ্যালক হত্যার নিন্দা করেছে এবং ঘটনার সময় যথাযথ নিরাপত্তা না দেওয়ায় ইউপি পুলিশকে নিন্দা জানিয়েছে। আহমেদ ও তার শ্যালককে গুলি করে হত্যা করা হয়। তিন ব্যক্তি সংবাদমাধ্যমের লোক পরিচয়ে হাজির হয়ে গ্যাংস্টারকে প্রায় ২২টা গুলি ছুড়েছিল। গ্যাংস্টারের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে কমিয়ে পিইউসিএল লিখেছে, ''রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন মন্ত্রী আতিক আহমেদ ও তার ভাই আশরাফ আহমেদকে ৩ সদস্যের গ্যাং দ্বারা ঠাণ্ডা মাথায় গুলি চালানোর জন্য পিইউসিএল ক্ষুব্ধ এবং দৃঢ়ভাবে নিন্দা জানায়''। আতিক আহমেদের অপরাধের তালিকা খুব লম্বা। নির্যাতিতরা বেশিরভাগই হিন্দু।

বহুদিন যাবৎ নিউজক্লিক ও সহযোগী কিছু সংবাদসংস্থা দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই তা প্রতিরোধ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং এটা তাদের আবশ্যিক কর্তব্যও বটে। তারা তাই করছে। □

বাঙালি হিন্দু এবং ইহুদি
একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সুশান্ত মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্বীকৃতি (১৯৪৭) এবং ইজরায়েল দেশের স্বীকৃতি (১৯৪৮) প্রায় সমসাময়িক। কিন্তু আমরা বাঙালি হিন্দুরা নিজেদের হোমল্যান্ড রক্ষা নিয়ে কি ইহুদিদের মতো ভাবতে পেরেছি?

ইজরায়েল নিয়ে একটু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক ঘটনাকে আমাদের সাদা চোখে একটু দেখা নেওয়া যাক।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়া ছাড়া আর যে দেশটি ভারতকে সাহায্য করেছিল সেটি ছিল ইজরায়েল। অনেক ইসলামি দেশের আগে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে ইজরায়েল বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি দেয় এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ চিঠি দিয়ে ইজরায়েলের স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান করেন।

বাংলাদেশের কাছে ইজরায়েলের স্বীকৃতি তো দূরের কথা, একজন বাংলাদেশি ইজরায়েল ভ্রমণ করতেও পারে না। ২০০৩ সালে বাংলাদেশি সাংবাদিক সালাহ চৌধুরীকে ইজরায়েল ভ্রমণের অপরাধে সাত বছরের জন্য জেলে কাটাতে হয়। যে পাকিস্তান ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ মানুষকে জেনোসাইড করেছিল তার সঙ্গে বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখে কিন্তু ইজরায়েলের সঙ্গে নয়। ইজরায়েল বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল এবং স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে একদম প্রথম দিকে ছিল।

ভারতের সঙ্গে ইজরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৯৯২ সালে। ভারত স্বাধীন হওয়ার দু-তিন বছর পর বিশ্ববিখ্যাত ইহুদি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন নেহরুকে অনুরোধ করেছিলেন ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার, কিন্তু নেহরু থেকে ইন্দিরা গান্ধী সবারই দ্বিধা ছিল। কারণ এতে নাকি ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বিরূপভাব তৈরি হবে এবং মধ্যপ্রাচের আরব দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হবে। ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের রূপকার পি ভি নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই সব ভণ্ডামি তুচ্ছ করে ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। সেই থেকে ইজরায়েল ভারতের এক অকৃত্রিম বন্ধুদেশ। ভারত ও ইজরায়েলের সম্পর্ক স্থাপনে ইজরায়েলের যতটা না লাভ হয়েছে, ভারত লাভান্বিত হয়েছে তার কয়েকগুণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষিক্ষেত্র, মহাকাশ গবেষণা, ডিফেন্স টেকনোলজি এবং ফিনান্সিয়াল সার্ভিসে ইজরায়েলি সহায়তা ভারতকে সমৃদ্ধ করেছে এবং করছে। ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে কার্গিল যুদ্ধে ইজরায়েল একমাত্র দেশ যারা ভারতকে অত্যাধুনিক রাডার ও স্যাটেলাইট দিয়ে সাহায্য করেছিল।

হিন্দু শরণার্থী

মাতৃভূমি রক্ষায় ইজরায়েলি মহিলা

ছোট্ট একটি দেশ ইজরায়েল। জনসংখ্যা মাত্র ৭০-৮০ লক্ষ। ১৯৪৮ সালে ইজরায়েল তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একযোগে আক্রমণ করে পাঁচ-পাঁচটি আরবদেশ—ইজিপ্ট, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডন ও ইরাক। জন্মের

বছরেই তার মৃত্যু হওয়ার কথা। কিন্তু ইজরায়েল তার থেকে অনেক বড়ো আক্রমণকারী দেশগুলোকে পর্যুদস্ত করে ।

১৯৬৭ সাল এবং Three No's–War of Attrition ''No peace, No recognition, No negotiation–destroy the State of Israel''. ৬৩০ গুণ আয়তনে বড়ো আরব দেশগুলি রেজোলিউশন পাশ করলো যে ইজরায়েলের ধ্বংসই একমাত্র কাম্য। ইজিপ্টের ক্যারিশম্যাটিক প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দেল নাসের রণহুংকার দিয়ে আরব দেশগুলিকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ইজরায়েলের ওপরে। যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ছ দিন। আবার শোচনীয় পরাজয়। ইজিপ্টের বিমানগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল ইজরায়েল। পরাজয়ের গ্লানিতে ১৯৭০ সালে মাত্র ৫২ বছর বয়সে হৃদরোগে মৃত্যু হয় জামাল আব্দেল নাসেরের।

৬ অক্টোবর, ১৯৭৩। আবার আক্রান্ত ইজরায়েল। দিনটা ছিল 'ইয়ম কিপ্পুর' ইহুদি ক্যালেন্ডারের এক পুণ্যদিন। উৎসবের আমেজে মত্ত ইজরায়েলি সেনাবাহিনী প্রস্তুত ছিল না একযোগে ১২টি আরবদেশের হঠাৎ আক্রমণের। ঘুরে দাঁড়াতে তাদের সময় লাগলো দু-তিনদিন। যুদ্ধের ফলাফল আরব দেশগুলির শোচনীয় পরাজয়। ইতিহাসে এটি ইয়ম কিপ্পুর যুদ্ধ নামে বিখ্যাত।

গাজায় প্রত্যাঘাতের কারণ....

একাধিক আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের সাইড এফেক্ট হলো গাজার অশান্তি। যেকোনো সম্পর্কই খারাপ হয় একে অন্যের প্রতি অবিশ্বাস থেকে। আগেকার পিএলও তথা এখনকার হামাস এবং ইজরায়েল কেউ কাউকে জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি নয়। ইজরায়েল নিজের বাহুবলে বলীয়ান আর হামাসকে সাহায্য করে আরব দেশগুলি। হামাস প্যালেস্তাইন থেকে মিসাইল ছোঁড়ে ইজরায়েলের জনবহুল জায়গা লক্ষ্য করে। টেকনোলজিতে বলীয়ান ইজরায়েলের আছে মিসাইল শিল্ড আয়রন ডোম। তারা প্রতিহত করতে পারে সেই আক্রমণ। পালটা আঘাত হানে ইজরায়েল। যুদ্ধবিমান দিয়ে বম্বিং করে আসে হামাস অধ্যুষিত জায়গায়। ফলাফল, হাজার হাজার নিরীহ প্যালেস্তাইনির মৃত্যু। ইজরায়েল রক্ষা করতে সমর্থ হয় তার নিজের দেশের নাগরিকদের।

আরবদের মানসিকতা এখনো সেই 'তিন না'-এর নির্ভরশীল--- 'নো পিস, নো রিকগনিশন, নো নেগোশিয়েশন—ডেসট্রয় দ্য স্টেট অফ ইজরায়েল।'

ইজরায়েলের জবাব '...if we were to lay down our arms today, there will be no Israel tomorrow.' সুতরাং যুদ্ধ চলছে, চলবে।

ইজরায়েল কি ইহুদিদের দখল করা দেশ?

প্রায় ৩৩০০ বছর আগে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন শহর জেরুজালেমে বাস করতো আজকের ইহুদিদের পূর্বপুরুষেরা। হিব্রু ভাষী, একেশ্বরবাদী ইহুদিরা বিশ্বের প্রথম আব্রাহামিক রিলিজিয়ন। প্রতিবেশী ছিল প্যাগান পূজারি আরবরা। ইসলামের উত্থান তখনো অনেক দেরি। প্রায় ২০০০ বছর আগে জেরুজালেম দখল করে রোমানরা। ইহুদিরা বিতাড়িত হয় স্বভূমি থেকে এবং ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। বিভিন্ন সময়ে 'ল্যান্ড অফ ইজরায়েল'-কে শাসন করে রোমান খ্রিস্টান ও আরব শাসকরা। জেরুজালেম একই সঙ্গে জুডাইজম, ক্রিশ্চিয়ানিটি, ইসলাম, সামারিটানিজম, দ্রুজ এবং বাহাই উপাসনার পবিত্র স্থান। পরে এটি দখলে আসে অটোমান সাম্রাজ্য ও ব্রিটিশদের। গত শতাব্দীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এবং চলাকালীন জার্মানিতে হিটলারের হাতে নিহত হয় প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদি, ইতিহাসে যা হলোকস্ট নামে পরিচিত।

অসংখ্য ইহুদি জার্মানি থেকে পালিয়ে চলে আসে আমেরিকা ও ব্রিটেনে। যুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর আমেরিকা, ব্রিটেন, ভারত এবং আরও বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ইহুদিরা তৈরি করে আজকের স্টেট অফ ইজরায়েল, ১৯৪৮ সালে। মানে 'ফ্রম ল্যান্ড অফ ইজরায়েল' টু 'স্টেট অফ ইজরায়েল'। মাঝে সময় কেটে গেছে ৩০০০ বছর বা তারও বেশি সময়।

কিন্তু এই স্টেট অফ ইজরায়েল তৈরি করলো এক ভীষণ সমস্যা। আরব দেশগুলির মাঝে অ-ইসলামি এক ইহুদি দেশ মেনে নিতে পারেনি কোনো আরব দেশই। ১৯৪৮ সালেই তারা আক্রমণ করে এই নবগঠিত দেশকে। সেই যুদ্ধের ট্রাডিশন সমানে চলছে।

ইহুদিরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তিতে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত জাতি হলেও তাদের ৩০০০ বছরের অস্তিত্ব রক্ষায় বা তাদের পবিত্র ভূমি রক্ষা তাদের কাছে সমান অগ্রাধিকার পেয়েছে ১৯৪৮ সাল থেকে। তাই যিনি ইহুদি শিক্ষক বা বিজ্ঞানী বা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বা অধ্যাপক বা প্রযুক্তিবিদ বা কৃষক বা কারখানার শ্রমিক অথবা সাধারণ চাকরিজীবী, তিনিই আবার নিজ জন্মভূমি বা পবিত্র ভূমি রক্ষায় দেশের সৈনিক হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে একবিন্দু দ্বিধাবোধ করেন না। পবিত্র দেশরক্ষা ও ধর্মরক্ষা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইহুদিদের কাছে সর্বোচ্চ প্রাধান্য পেয়েছে। তাই যুদ্ধের ডাক পড়লে কৃষক-শ্রমিক থেকে বিজ্ঞানী-শিক্ষক সবাই এক সারিতে মিলিত হয়ে নিজের জীবনপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। কারণ ইহুদিরা জানে পৃথিবীর ইতিহাসে যে প্রতিরোধ করেছে, সেই জাতি তার অধিকার কায়েম করতে পেরেছে।

বাঙালি হিন্দু যারা উদ্বাস্তু হয়ে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারত বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছেন, তারা ইজরায়েল থেকে কি কিছু শিক্ষা গ্রহণ করলেন? মনে হয় এখনো কিছুই শিখিনি। শিখিনি বলেই বাঙালি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আপামর বাঙালি হিন্দুরা এখনো যোগ্য সম্মানটুকু জানাতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এখনো ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি ভাঙা হয়। ৭৭ বছর আগে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নর-নারীর জীবনের বিনিময়ে অনেক আন্দোলন-লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে পাওয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নিয়ে ইহুদি আবেগের মতো আমাদের বাঙালি হিন্দুদের পিতৃপুরুষের ভূমির প্রতি আবেগ যেদিন জাগ্রত হবে, সেদিন বাঙালি হিন্দুও ইহুদিদের থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে থাকবে না, তারাও পৃথিবীর মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবে। □

দুর্নীতির আঁতুড়ঘর পশ্চিমবঙ্গ

বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করছি একের পর এক মন্ত্রী, প্রভাবশালী নেতারা এক এক করে জেলে যাচ্ছেন এবং এদের জেলে যাওয়ার কারণ সকলেরই একই দুর্নীতি, তা হলো চুরি। দুর্নীতির জালে জড়িয়ে তাদের ঠাঁই হয়েছে তিহার, প্রেসিডেন্সি ও অন্যান্য জেলে। কেউ শিক্ষা দপ্তরে দুর্নীতির দায়ে কেউ-বা শিক্ষা দেওয়ার বদলে কিলো কিলো দরে শিক্ষা বেচেছেন, কেউ খাদ্য দপ্তরে রেশন দুর্নীতির দায়ে আবার কেউ-বা গোরুপাচার কাণ্ডে। পশ্চিমবঙ্গ যেন আজ দুর্নীতির আঁতুড় ঘরে পরিণত হয়েছে। আর এই প্রত্যেকটি দুর্নীতির দায় দিদির ভাইদের দিকে যারা কিনা মানুষকে সেবা দেওয়ার ও নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মন্ত্রী হয়ে জনগণের টাকায় কোটি কোটি টাকা সম্পত্তি বানিয়ে নিজের আখের গুছিয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ও তরুণ সমাজ শান্ত হয়ে বসে আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের নাম রাজ্যের শাসক দল দলের নামে চালিয়ে নিজের ভোটব্যাংক বাড়াচ্ছে এবং সেখানেও দুর্নীতি করছে। এভাবেই যদি দুর্নীতি ক্রমাগত চলতে থাকে তাহলে এই রাজ্য অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক দলকে উৎখাত করা বিতাড়িত না করা হলে পশ্চিমবঙ্গকে দেউলিয়া হতে আর বেশিদিন নেই, শুধু সময়ের অপেক্ষা। অর্থাৎ এক কথায় সাধের সোনার পশ্চিমবঙ্গ আজ দুর্নীতির আঁতুড়ঘর।

—দেবব্রত ভৌমিক,
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর।

খেলো ইন্ডিয়ার বাস্তবায়ন প্রয়োজন

গত ১৯ নভেম্বর হয়ে গেল পুরুষদের ২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনাল। ভারত এই ম্যাচে প্রত্যাশিত ফল করতে পারেনি। ৭ উইকেটে তারা অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হয়। ভারতীয় দলের প্রতি ক্রিকেট অনুরাগীদের চূড়ান্ত প্রত্যাশার ফানুসটি যেন ফেটে গেল। যদিও গোটা টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স ছিল ভালো। সেমিফাইনাল- সহ টানা ১০টি ম্যাচ জিতে ভারতীয় দল ফাইনালে ওঠে। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী যেন এই যাত্রায় সদয় হলেন না। পরিণাম— 'স্বপ্নভঙ্গ'।

আইপিএলের দৌলতে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রভূত উন্নতি আজকাল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু তারপরেও বিশ্বকাপ জয় অন্যবারের মতোই থেকে গেল অধরা। ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ আয়োজিত হওয়ার দরুন প্রত্যাশার চাপও ছিল সবচেয়ে বেশি। ভারতীয় দল হয়তো সেই চাপ সামলাতে ব্যর্থ! ভারতে পুরুষদের ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার সঙ্গে অন্য সব রকম খেলাধুলারই সরকারি ও ক্রীড়ামোদী— উভয় মহলের সমর্থন ও আনুকূল্য প্রয়োজন। তাহলে একটি মাত্র খেলার প্রতি দেশ নির্ভরশীল হবে না বা সেই খেলার সর্বোচ্চ ট্রফি (অর্থাৎ বিশ্বকাপ)-এর ফাইনালে পরাজয়ের কারণে হতাশা জাতিকে গ্রাস করবে না এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হবে। যদিও ক্রিকেট নিয়ে মাতামাতি গোটা দেশ জুড়েই খুব বেশি। কিন্তু এই ক্রিকেট কেন্দ্রিকতা থেকে দেশকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে হবে। সব ধরনের খেলা দেখা এবং সেই খেলায় অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে এক নতুন ভারত গঠনের দিকে ভারতীয় ছাত্র ও যুবসমাজের এগিয়ে চলা আবশ্যক। চীনে আয়োজিত ২০২৩ এশিয়ান গেমসে ভারতের তরফে ১০০-রও বেশি পদক জয় হয়তো এক নতুন সময়কেই সূচিত করছে।

আমাদের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গও খেলাধুলার ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। বর্তমান ওডিআই ফরম্যাটের জাতীয় ক্রিকেট দলে কোনো বাঙ্গালি ক্রিকেটার নেই। পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়াক্ষেত্রের এই শোচনীয় অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়াপ্রেমী জনতার কাছে বেদনাদায়ক। পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রের সার্বিক উন্নতি সাধনের জন্য, খেলাধুলার মান আন্তর্জাতিক স্তরের সমতুল্য হয়ে ওঠার জন্য দেশ জুড়ে 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন বিশেষ প্রয়োজন।

—অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়,
দমদম, কলকাতা।

উপাসনা শরীর সুস্থ ও মন স্থির করে

বর্তমান সময়ে যুগোপযোগী ক্রমবিবর্তনের ধারায় স্বার্থান্বেষী উপাসনা চলে আসছে। উপাসনা আদতে স্বাস্থ্যতত্ত্বের আরাধনা। স্বার্থান্বেষী ধর্ম মানলে অসুখ হবে কেন? কিন্তু কোনো উপাসনা শাস্ত্রমতে হচ্ছে না। 'শরীরম্ অদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্' অর্থাৎ শরীর সাধনাই যে আসল ধর্ম সাধনা। এই আপ্তবাক্যটি মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে হয়। 'ধর্মস্য তত্ত্বম্ নিহিতং গুহায়াম্'। জ্ঞানাৎ পরতং নাস্তি অর্থাৎ জ্ঞানের উপরে কোনো ধর্ম নেই। 'সুখস্য মূল ধর্মঃ' অর্থাৎ সুখের মূলেই ধর্ম আছে। ধর্ম হলো ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞানানুভূতি সংস্কারের ব্যাপার। এক মহান ধর্ম সংস্কারক ভগবান গৌতমবুদ্ধ বলেছেন, অভিমান থাকলে সত্য জানতে দেয় না।' 'প্রকৃত জ্ঞান নিজেকে জানার মধ্যে, অন্য কিছুকে জানার মধ্যে নয়'— সক্রেটিস। 'জীবনের আনন্দ ও সুখ শুধুমাত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সম্ভব'---সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। পূজা রূপান্তরের বিজ্ঞান। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের পূজা ব্যর্থ হয়।

ইন্দ্রিয়গণ সর্বদা বাহিরের বিষয়ের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। ইন্দ্রিয়ের রাজা মন। সেই মনকে অন্তর্মুখী করতে পারলেই শান্তির পথ উন্মুক্ত হবে। ইন্দ্রিয়গণ শান্ত হবে। অনবরত নাম করতে করতে ভেতরে অনাহত— নাদ পাওয়া যাবে। সেই নাদে মন মগ্ন হলেই শান্তি অনিবার্য। লোক দেখানো নয়, অন্তর থেকে যত্নশীল হলে নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক পথে যাওয়া যাবে। যে ধর্ম মানবধর্মকে আঘাত করে, সেই ধর্ম অসত্য দ্বারা আশ্রিত ও বিনাশকারী। আসলে ভাবনা যেমন হবে, সিদ্ধিলাভও তেমন হবে। মানুষের মনুষত্বই

ফঃ ৩

প্রধান ধর্ম ও একমাত্র সত্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, 'হে বিধাতা পুরুষ কোটি কোটি লোক গড়িতে গড়িতে হঠাৎ একজন মানুষ গড়িয়া ফেলিয়াছেন। সেই মানুষ দয়ারসাগর, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাসংস্কারক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'। যিনি ধর্মকে নয়, মানুষকেই বড়ো করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রকৃত মানুষ বিদ্যাসাগর। নানা ক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা হোক রোগাক্রান্ত সময় ও সমাজের আরোগ্য লাভের অব্যর্থ মহৌষধ। কিন্তু মন ধর্মে নয় বাজে কাজে খরচ হচ্ছে।

—অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ,
দেউলটি, হাওড়া।

আমরা কী খেয়ে বাঁচবো

মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য তিনটি মৌলিক চাহিদা হলো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। প্রথম চাহিদা হলো অন্ন। আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এখনও বহু মানুষ দুবেলা ঠিক মতো অন্ন জোটাতে পারেন না। আর এই অন্ন সংস্থানের জন্য মানুষকে নানা কাজ করতে হয়। আমরা সর্বভুক প্রাণী, তাই আমরা সব ধরনের খাদ্য খাই কিন্তু ভেজাল খাদ্য, পচা, বাসি, অখাদ্য, কুখাদ্য খাওয়া আমাদের শরীরে সহ্য হয় না। আমাদের শক্তির প্রধান উৎস হলো খাদ্য। খেলে আমরা কাজ করার বা বেঁচে থাকার জন্য শক্তি পাই। বর্তমানে মানুষ সীমাহীন লোভের শিকার হয়ে অধিকাংশ খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ খাবারের খাদ্য গুণ আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে। পরিবর্তে মুখরোচক করতে গিয়ে ক্ষতিকারক বিভিন্ন রাসায়নিক মেশানো হচ্ছে। রান্নার জন্য সরিষার তেল কিনবে তাতে ভেজাল। মশলা কিনবে তাতে ভেজাল। শিশুদের জন্য দুধ কিনবে তাতেও বিভিন্ন রকম ভেজাল মেশানো হচ্ছে।

এমনকী ভাতের জন্য চালকেও প্লাস্টিকের বানিয়ে ফেলা হয়েছে। শাকসবজি টাটকা রাখার জন্য ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে। বাঙ্গালির প্রিয় মাছকেও সতেজ রাখার জন্য ফরমালিনের মতো মারাত্মক ক্ষতিকারক রাসায়নিক মিশিয়ে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। বাজারে যা কিনতে যাবেন তাতেই শুধু ভেজাল আর ভেজাল। সব চেয়ে বড়ো ব্যাপার হলো আধুনিক সভ্য সমাজের যারা উচ্চ বিত্তশালী তারা হোটেলে, রেস্তোরাঁতে বিভিন্ন আধুনিক খাবার খেতে বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু সেখানে পয়সা দিয়ে এতদিন ভাগাড়ের মরা, পচা, বাসি মাংস খেয়ে এসেছেন। মিডিয়ার দৌলতে এইসব কিছু সবাই জানতে পারছেন। প্রশ্ন হলো, এতদিন পর্দার আড়ালে এইসব অসাধু কারবার কীভাবে চলছে?

ভাবতে অবাক লাগে এইসব দেখাশোনার জন্য ফুড কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের ভূমিকা নিয়ে। হোটেল, রেস্তোরাঁ, বাজারে ভেজাল খাদ্য দ্রব্য অবাধে বিক্রি হচ্ছে অথচ তাঁরা কিছুই জানতে পারছেন না। অর্থের জন্য ভেজাল আর ভাগাড়ের মাংস বাজারে ছড়াতে ঠাণ্ডা ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন তারা। একবার ভাবুন, তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবও এইসব খাবার খাচ্ছেন। তাদের আত্মীয়-পরিজনদেরও নানা শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারেন। তাহলে আমরা কি খেয়ে বাঁচবো? আসলে আমরা বুদ্ধিমান প্রাণী আমাদের বিলাসিতার জন্য অনেক অনেক অর্থের প্রয়োজন তাই মানুষ অন্তহীন লোভের শিকার হয়ে এইসব বিষ মেশাতে বা ভাগাড়ের মরা, পচা মাংস বিক্রি করতে পিছুপা হচ্ছে না। হয়তো মানুষ হয়ে মানুষের মাংস খাবেন তাদের অজান্তেই।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোণা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

অমৃতলোকে সন্দীপ চক্রবর্তী

স্বস্তিকা দপ্তরে আসতেই বিজয়দা আমাকে বললেন, 'সন্দীপদার কোনো খবর আছে?' আমি বললাম 'ফোন করা হয়নি'। আমি এখনই ফোন করছি।' সন্দীপদার বোনকে ফোন করে উত্তর পেলাম না। রাত্রি ১০টায় অজিতদা আমাকে প্রথম জানালেন সন্দীপদার মৃত্যুর খবর। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এত তাড়াতাড়ি সন্দীপদাকে হারাবো ভাবতেই পারিনি। সুকেশদাকে ফোন করে জানতে পারলাম নাইটিঙ্গেল নার্সিংহোমে মারা গেছেন। ওখান থেকে সরাসরি শিবপুর শ্মশানে নিয়ে আসবে। তারপর সন্দীপদার বোনকে ফোন করে জানলাম ওঁরা বাড়ি হয়ে শ্মশান ঘাটে আসবে। রাত্রি ১টায় আমি শিবপুর শ্মশান ঘাটে পৌঁছালাম। মুখাগ্নি সন্দীপদার বোন করলেন। 'বলো হরি হরি বোল' বলে আমরা সন্দীপদাকে শেষ বিদায় জানালাম। কয়েকটি বিশেষ কথা বলে কিছুক্ষণ শ্মশানে থেকে আমি ব্যথিত হৃদয়ে বাড়ি ফিরলাম।

অসুস্থতার কারণে সন্দীপদা পূজার আগে প্রায় ২ মাস ধরে অফিসে আসছিলেন না। তাই একদিন আমি, তিলকদা ও সুকেশদা সন্দীপদাকে দেখতে বাড়ি গেলাম। ওঁর বোন আমাদের বাইরের ঘরে বসালেন। সন্দীপদা এলেন একটি চেয়ারে বসে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বললেন, 'ডাক্তার বলেছে নার্ভের সমস্যা থেকে এসব হচ্ছে, আমাকে স্নান করতে বারণ করেছে। তিলকদা ও সুকেশদা সন্দীপদাকে কোনো ভালো নার্সিংহোমে ভর্তি করে সমস্ত প্যাথোলজিক্যাল টেস্টগুলো করার পরামর্শ দিলেন এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে চেন্নাইয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন, আর আমাকে সন্দীপদার সঙ্গে পাঠাবে। সন্দীপদাকে ওরা নাইটিঙ্গেল নার্সিংহোমে ভর্তি করে সমস্ত টেস্ট করালো। কিন্তু অদৃষ্টের কী পরিহাস! সবাইকে ফাঁকি দিয়ে গত ১ নভেম্বর সন্ধ্যে ৫-৩০ মিনিটে অমৃত লোকে চলে গেলেন।

আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, কোনো বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত, অমায়িক ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

—সঞ্জয় মুখার্জি,
শিবপুর, হাওড়া।

মাতৃদুগ্ধ অমৃতসম

শুভশ্রী দাস

মায়ের দুধকে অমৃত বলা হয়। নিয়ম মেনে শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ পান করালে শিশু জীবনযুদ্ধে অনায়াসে জয়লাভ করতে পারে। অর্থাৎ শিশুর শরীরে রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। মায়ের দুধে অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। শিশুর মস্তিকের বিকাশের জন্য আবশ্যক ওমোগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ও কোলেস্টারলের প্রয়োজন হয়, তা মায়ের দুধেই পাওয়া যায়। শিশুর কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ল্যাকটোজ ও গ্যলোকটোজ নামে শর্করাও এর মধ্যে থাকে। ভিটামিন এ, ডি, ই, সি এবং ক্ষার প্রয়োজন মাত্রায় থাকে। মায়ের দুধ পানকারী শিশুকে জলপান করানোর প্রয়োজন হয় না। মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে শিশু আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পায় তা হলো এনার্জি ও গৃহপালিত পশুপাখির থেকে সুরক্ষা। শিশুর জন্মের পরেই মাতৃস্তন্য থেকে ঘন হলুদ তরল নির্গত হয়, তাকে কোলোস্ট্রাম বলা হয়। এর মধ্যে জীবনদায়ী অনেক উপাদান থাকে।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকে মায়ের কাছে আনা হয়। মায়ের স্পর্শ পেতেই শিশু কোলোস্ট্রাম নেওয়ার চেষ্টা করে। শিশুর মুখের স্পর্শ পেতেই মায়ের দুধ আপনা হতেই ক্ষরণ হতে শুরু করে। প্রথমদিনে শিশু এক বা দেড় চামচ দুধ পান করে কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে ৩০ থেকে ৬০ মিলিলিটার দুধপান করতে শুরু করে। নবজাত শিশু দিনে ৮ থেকে ১২ বার দুধ পান করতে পারে। এই সময় মাকে নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এই সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংযম পালন করা। মায়ের চিন্তাভাবনা সবই দুধের সঙ্গেই শিশু গ্রহণ করে।

ইদানীংকালে আমাদের দেশের মায়েরা শিশুকে স্তন্যপান করানোর ব্যাপারে খুবই অনভিজ্ঞ হয়ে পড়েছেন। এজন্য সারা দেশে স্তন্যপান নিয়ে সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। স্তন্যপান নিয়ে ভুল ধারণাগুলো বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল। যেমন, প্রাণদায়ী কোলোস্ট্রাম শিশুকে পান না করিয়ে জলে ফেলে দেওয়া। যার ফলে শিশুর রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যেত। ফলে শিশুমৃত্যুর হারও বাড়তে থাকে। আধুনিকতার নাম দিয়ে অনেক মা-ই টানা ছ'মাস শিশুকে স্তন্যপান করাতেন না। একটি পরিসংখ্যানে জানা যায়, ভারতে একটানা শুধু স্তন্যপান করাতেন মাত্র ২০ শতাংশ মা। এ কারণে অপুষ্টিজনিত রোগে ০-৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ৯৫।

সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, শিশুকে স্তন্যপান করানোর সঠিক পদ্ধতিই জানেন না আমাদের রাজ্যের আধুনিক মায়েরা— এমনটাই একটি সমীক্ষায় ওঠে এসেছে। মজার বিষয় হলো— এ বিষয়ে গ্রামের থেকে শহরের মায়েরাই বেশি অনভিজ্ঞ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন— স্তন্যদুগ্ধ শিশুর শরীরে ন্যাচারাল কিলার সেল বাড়িয়ে দেয়। ফলে ক্যানসারের আশঙ্কা কমে। ডায়াবেটিস, ওবেসিটি, হাইবিপি, হাইপার লিপিডেমিয়ার প্রবণতা কমে। শিশুর ড্রিহাইড্রেশন, ম্যালনিউট্রিশনের সম্ভাবনা কমে। স্তন্যপান করানোর ফলে মায়ের লাভ হয়— ব্রেস্ট ক্যানসারের সম্ভাবনা কমে, পোস্টপার্টাম ব্লিডিং তাড়াতাড়ি কমে, গর্ভাশয় খুব তাড়াতাড়ি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং স্তন্যপান করানোর সময় ফার্টিলিটির সম্ভাবনা কম থাকে।

কিন্তু অনেক কারণে কোনো কোনো মা তাঁর শিশুকে স্তন্যপান করাতে পারেন না। এক্ষেত্রে সেই শিশুদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে 'হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক' অর্থাৎ মায়ের দুধের ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। মুম্বইয়ের ডাঃ আরমিডা ফার্নান্ডেজ এরকম হতভাগ্য শিশুদের কথা ভেবে ১৯৮৯ সালে এশিয়ার প্রথম 'হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক' শুরু করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি 'সিনিয়র কমনওয়েলথ ফেলোশিপ' ছাত্রবৃত্তির জন্য লন্ডন গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি মাতৃদুগ্ধ ব্যাংকের ধারণা পান।

ডাঃ আরমিডার পরিকল্পনা ভারতের সব রাজ্যই গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের এস এস কে এম হাসপাতালের 'ব্রেস্ট মিল্ক ব্যাংক' গত বছর শুরু হয়েছে। এক বছরে 'ব্রেস্ট মিল্ক ব্যাংক'-এ প্রায় দু' হাজার মা ৮৫০ লিটার দুধ দান করেছেন। একটি গবেষণায় জানা যাচ্ছে— স্তন্যপান না করালে শিশুর বুদ্ধি একেবারেই কমে যায়। দেশে বুদ্ধিহীন মানুষের সংখ্যা যাতে আর না বাড়ে সেজন্য মায়েরা এখন সচেতনভাবে শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছেন। আর মায়ের দুধ না পাওয়া শিশুদের জন্য 'মাতৃদুগ্ধ ব্যাংক'ও প্রচারের আলোয় এসে গেছে। এস এস কে এস হাসপাতালের নিওন্যাটোলজিস্ট ডাক্তারবাবুর কথায়— ''আমাদের হাসপাতালে স্তন্যদানে অসমর্থ মায়ের নবজাত শিশুদের সবাইকে আমরা 'মাতৃদুগ্ধ ব্যাংক' থেকে দুধ দিচ্ছি। এটা ওদের নবজীবন দান করছে।'' ■

শরীরে রোগ বাসা বাঁধাই ম্যালাইসের অন্যতম কারণ

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

ম্যালাইস নামটি আমাদের কাছে প্রায় অচেনাই। তবে এর উপসর্গ আমরা সকলেই জানি। সাধারণ বাংলায় ম্যালাইস মানে গা ম্যাজম্যাজ করা। চিকিৎসাবিজ্ঞান জানাচ্ছে কোনো মানুষের যদি সাধারণভাবে অস্বস্তির অনুভূতি হয় শরীরে, জ্বর জ্বর ভাব, ক্লান্তি লাগা, গায়ে-হাত-পায়ে ব্যথা এবং কোনো কাজেই এনার্জি না পাওয়া কিংবা প্রায় সবসময়েই ঘুম পাচ্ছে, সেই অবস্থাকে বলা হয় ম্যালাইস। বিভিন্ন কারণের জন্য ম্যালাইস হতে পারে।

ম্যালাইস আসলে শরীরের ভিতরে নির্ণয় না হওয়া কোনো রোগের বহিঃপ্রকাশ। কোনো কোনো সময়ে কয়েকদিন ধরে ম্যালাইস হয়, আবার অনেকের ক্ষেত্রেই এটা ক্রনিক থাকে। কয়েকদিন পর পর ফিরে আসে এবং তখন শরীর জুড়ে একটা ভয়ংকর অস্বস্তি ঘিরে থাকে। কেননা শরীরে হয়তো কোনো বড়ো রোগ বাসা করেছে। এক একজনের ক্ষেত্রে শুধু গা ম্যাজম্যাজানি, জ্বর জ্বর ভাব থাকে, আবার অনেকের এর সঙ্গে অন্য উপসর্গও থাকে।

বিশেষ কোনো পরিশ্রম ব্যতীত দিনের পর দিন মনে গা ম্যাজম্যাজ করে। তবে বিমানযাত্রা করার পরে হতে পারে, তাকে বলে জেটল্যাগ। ভাইরাস সংক্রমণ হলে অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, অরুচি হতে পারে। ওষুধের পার্শ্বপ্রতিইক্রয়া থেকেও হয়। গর্ভবতী মহিলা যাঁদের বয়স হয়েছে মাঝেমধ্যেই ম্যালাইসের সমস্যা ভোগায়। দীর্ঘসময় কোনো ব্যক্তি ভোগেন শারীরবৃত্তীয় কারণের মধ্যে প্রথমেই ম্যালাইস এর পিছনে আছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অ্যানিমিয়ার কথা। অ্যানিমিয়ায় মানুষ এমনিতেই ক্লান্তবোধ করে বিছানা থেকে উঠতে পারে না।

ক্রনিক ফ্যাটিগ সিনড্রোম, ফাইব্রোমায়ালজিয়ার থেকেই ম্যালাইস হতে পারে। কোনো ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে ভোগেন, তাঁর শরীর এমনিতেই কোনো কাজেই এনার্জি পায় না, এটাও ম্যালাইসের অন্যতম কারণ।

একটানা অনেকদিন ধরে কিডনির কোনো সমস্যা কিংবা মূত্রথলিতে সংক্রমণ, নেফ্রাইটিসের মতো রোগে ম্যালাইস হতে পারে। লিভারের সমস্যা বিশেষ করে জন্ডিস ও ফ্যাটি লিভারের ক্ষেত্রে ম্যালাইস হতে পারে। কিংবা হেপাটাইটিস এ বা সি সংক্রমণ হলে এইডস বা ক্যানসারের রোগীরা অনেকসময়ে ম্যালাইসের কথা বলেন।

কোনো বড়ো রোগ যেমন টাইফয়েড, ডেঙ্গু থেকে সেরে ওঠার সময়েও ম্যালাইস হয়। সেক্ষেত্রে অনেক সময়েই দেখা গেছে জ্বর আসে না, কিন্তু শরীর জুড়ে একটা জ্বর জ্বর ভাব থাকে।

ভাইরাল ফ্লু, সর্দি-কাশিতেও ম্যালাইস হতে পারে। এছাড়া ফুসফুসের রোগ ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজঅর্ডার হলেও ম্যালাইস হয়।

শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কোনো কারণ ছাড়া হাড়ের জয়েন্টে কিংবা পেশিতে ব্যথা হয়। পেশি মনে হয় স্টিফ হয়ে গেছে। হাত-পা সামান্য নাড়াতেই কষ্ট হয়।

মানসিকভাবে মানুষ অত্যন্ত অবসাদে ভুগতে থাকে, শরীর জুড়ে অস্বস্তি, অথচ তখনও কোনো রোগ নির্ণয় হয়নি। বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে মনে হয় এই বুঝি দাঁড়াতে পারব না, পড়ে যাব, এতটাই দুর্বল হয়ে যায় শরীর।

কারও কারও ক্ষেত্রে উপসর্গগুলি আচমকা দেখা দেয়, আবার বিপরীতভাবে অনেকদিন ধরে এই উপসর্গগুলি চলতে চলতে বাড়ছে এমন সমস্যাও হয়। অনেকের ক্ষেত্রে ম্যালাইস আসা-যাওয়া করতে থাকে। কিছুদিন ভালো থাকলেন আবার কখনও খারাপ হলো। এরকমটা হলে কেউই নিজে বুঝতে পারেন না, তখন চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়।

জটিলতা—

দীর্ঘদিন ধরে কেউ যদি ম্যালাইসের সমস্যা নিয়ে চলেন তাহলে তাঁকে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে। কেননা এর পিছনে উৎসটা কী তা সবার আগে দেখতে হবে। বিশেষ করে ডায়াবেটিস, এইডস বা ক্যানসার রোগীরা।

এই রোগগুলির চিকিৎসা যদি না করা হয়, তাহলে দীর্ঘদিন ধরে ম্যালাইস বাড়তে বাড়তে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তবে বিমানযাত্রা, অতিরিক্ত পরিশ্রম কিংবা সাধারণ সর্দি-জ্বরে যেসব ম্যালাইস হয়, সেগুলি সাময়িক, এগুলি আপনা থেকে চলে যায়। ম্যালাইস রোগী যখন চিকিৎকের কাছে যান, তখন প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসকরা সবসময়ে বুঝতে পারে না কী কারণে ম্যালাইস হয়েছে। কারও যদি আগে থাকতেই ক্যানসার, কিডনি বা লিভারের সমস্যা থাকে কিংবা ফ্লু , সেক্ষেত্রে কারণটা বোঝা যায়। মোটের উপর ম্যালাইসের পিছনে একাধিক সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে।

চিকিৎসা—

হোমিওপ্যাথিতে চিকিৎসক রোগীর মেডিক্যাল হিস্ট্রি নেন। কারণ, লক্ষণ ও মায়াজম মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায়। রোগী কতটা পরিশ্রম করে, কী কী খাবার খান, কতক্ষণ ঘুমোন, রাতে ঠিকমতো ঘুম হয় কিনা, বিশেষ কোনো ওষুধ খান কিনা, মাদকসেবনের অভ্যাস আছে কিনা বা নিজে নিজে কোনো ওষুধ খেয়েছেন কিনা, কোনো ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট নিচ্ছেন কিনা বা কোন কোন রোগের পারিবারিক ইতিহাস আছে, ইত্যাদি সমস্ত কিছু চিকিৎসক খতিয়ে দেখে তবে চিকিৎসা শুরু করেন। এর সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গগুলিকেও মিলিয়ে দেখেন।

ম্যালাইস কমানোর এমনিতে কোনো ওষুধ নেই। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম, এক্সারসাইজ, স্ট্রেচিং, অ্যারোবিক্স করলে উপকার মিলবে।

কারও যদি মানসিক অবসাদ থেকে ম্যালাইস হয় তাকে অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়, যাতে মানসিক জোর বাড়ে। এটা বাড়লে শরীরে এনার্জি পাওয়া যায়। কিছু ক্ষেত্রে কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি করানো হয়।

ম্যালাইসের চিকিৎসা নির্ভর করে এর কারণের উপরে। শরীরে কোনো রোগ থেকে ম্যালাইস দেখা দিলে সেই রোগটির চিকিৎসা আগে করতে হয়। অনেকের আবার অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ করলেও এই সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে ক্যাফেইন ইনটেক কমাতে হবে। সাধারণত শরীরে এনার্জি বাড়ানোর জন্য ক্যাফেইন দেওয়া হয়। কিন্তু বেশিমাত্রায় হয়ে গেলে এটি বিপরীত কাজ করে ম্যালাইসের সমস্যা সৃষ্টি করে।

যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০০২৩৪৮৭

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা রক্ষায় গুরু নানকের মত ও পথের পুনঃস্মরণ অত্যন্ত জরুরি

পিন্টু সান্যাল

হিন্দু সমাজ যখনই আপন সংস্কার ভুলে বিভিন্ন কুরীতি ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়েছে তখন প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সংস্কারক আবির্ভূত হয়েছেন এবং স্মরণ করিয়েছেন একাত্মতার, আধ্যাত্মিকতার মূল সূত্রগুলিকে। দক্ষিণ ভারতে ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন আদি শঙ্করাচার্য। সেইসময় থেকেই (সপ্তম শতাব্দী) ঈশ্বরের একটি রূপের প্রতি সমর্পণের মাধ্যমে যে ভক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা অন্তঃসলিলা রূপে কখনও সগুণ, কখনও নির্গুণ ঈশ্বরোপাসনার মাধ্যমে ভারতবর্ষকে আপন সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে শক্তি সরবরাহ করেছে। দক্ষিণ ভারতে ভগবান বিষ্ণু ও শিবের প্রতি ভক্তি দিয়ে শুরু হয়ে, উত্তর ভারতে শ্রীরামচন্দ্র, পূর্ব ভারতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির মাধ্যমে ভক্তি আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহারাষ্ট্রে নামদেব (১২৭০-১৩৫০), উত্তর ভারতে রামানন্দ (১৩০০-১৩৮০), কবীর (১৩৯৮-১৫১৮) ভক্তির মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য, কুপ্রথা বিনাশের চেষ্টা করেন। সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণকারীদের দখলে চলে যাওয়ার ফলে (৭১২) ভক্তি আন্দোলনকে আপন সংস্কৃতি থেকে কুপ্রথা দূর করার সঙ্গেই প্রতিকূল পরিবেশে আপন সংস্কৃতি, দর্শন, জীবন পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখার ভার নিতে হলো। কিন্তু বিধর্মীদের নৃশংসতা ব্যক্তিগত উপাসনা স্বাধীনতার সম্মুখীন হতে হয়। তাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ঈশ্বরোপাসনার অধিকারের দুই শর্ত পূরণ হলো ভক্তি আন্দোলনে নির্গুণ ব্রহ্মের পথে চালিত হওয়ায়। পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়ের পর আড়াইশো বছরের বেশি কেটে গেছে, দিল্লিতে সেইসময় লোদি বংশের রাজত্ব।

পঞ্জাব প্রদেশের তালওয়ান্ডি গ্রামে কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ১৪৫৯ সালে আবির্ভূত হলেন গুরু নানক। বর্তমানে নানকানা সাহিব নামে পরিচিত গুরু নানকের জন্মস্থানটি বর্তমান পাকিস্তানের অধিকারভুক্ত। নানকের পিতা মেহতা কালু ছিলেন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের। মাতার নাম তৃপ্তা দেবী। ছোটো থেকেই নানক ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর মন সর্বদাই ঈশ্বর অনুসন্ধানে বিভোর থাকতো। তিনি কিছুদিন সুলতানপুরে তাঁর বোন নানকির কাছে থাকার সময় সরকারি শস্যভাণ্ডার দেখাশোনার কাজ করেন। ২৮ বছর বয়সে নানক বিয়ে করেন। তাঁর দুই পুত্রের নাম শ্রীচান্দ ও লক্ষ্মী চান্দ। একদিন পুকুরে স্নান করতে গিয়ে নানক তিনদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং সেই সময় তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন। ৩০ বছর বয়সে তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান করতে শুরু করেন। আরবীয় সাম্রাজ্যবাদের আবহে পঞ্জাব প্রদেশে ভক্তি আন্দোলনে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং সমাজ সংস্কারে জন্য তিনি শিখ

পন্থের প্রবর্তন করেন এবং প্রধান তিনটি স্তম্ভ গঠন করেন— নাম জপ অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা, কিরাত করা অর্থাৎ সৎ জীবন যাপন করা এবং ভাণ্ড চাকনা অর্থাৎ নিজের অর্থের কিছু অংশ সমাজের উদ্দেশ্যে দান করা এবং যাদের প্রয়োজন তাদের সাহায্য করা। তিনি শিখ সমাজে সামাজিক ভোজনপ্রথা অর্থাৎ 'লঙ্গর' ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন যা এখনো সমান উৎসাহে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির-সহ বিভিন্ন গুরুদ্বারায় অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রতিদিন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একসঙ্গে ভোজন করেন এবং ভোজনের জন্য স্বেচ্ছায় সেবাদান করেন। নানকের মতে ঈশ্বর এক এবং ঈশ্বরের কোনো আকার, বর্ণ, লিঙ্গ নেই অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাই শিখ পন্থের মূলমন্ত্র।

গুরু নানক বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান যা ছান্দোগ্য উপনিষদের বাণী 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'কে স্মরণ করিয়ে দেয়। সনাতনী পরম্পরার মতোই শিখপন্থ পুনর্জন্মবাদ ও কর্মসংস্কারে বিশ্বাস করে। পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভকেই চরম লক্ষ্য মনে করতেন গুরু নানক এবং মোক্ষলাভের উপায় হলো পুণ্যকর্ম ও আধ্যাত্মিক জাগরণ। সনাতন ধর্মে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মাৎসর্যকে মানুষের ছ'টি শত্রু বা ষড়রিপু বলা হয়েছে। সেইরকমই শিখ উপাসনা পদ্ধতিতে লোভ, লালসা, ক্রোধ, অহং, আসক্তিকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। মায়া বা অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত হতে সেবা ও সৎকর্মকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে।

গুরু নানক তাঁর বাণী প্রচারের জন্য ভক্ত মারদানাকে সঙ্গী করে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। গুরু নানক ১৫০০ থেকে ১৫২৪ সালের মধ্যে মোট পাঁচবার আধ্যাত্মিক ভ্রমণে বের হন যা শিখ পন্থে 'উদাসী' নামে বিখ্যাত। তিনি সারা বিশ্বে সত্যানুসন্ধান ও শিখ পন্থের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে মোট প্রায় ২৮০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। তৎকালীন ভারতবর্ষের অসম, সিকিম, কাশ্মীর, কাশী, নেপাল, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা, শিয়ালকোট-সহ বিভিন্ন স্থান এবং ইরাক, তুরস্ক ও আরবদেশ তিনি ভ্রমণ করেন।

ভক্তি আন্দোলনের ফলে গীতা, উপনিষদের শ্লোক-সহ রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা ও মাহাত্ম্য আঞ্চলিক ভাষাতে বিভিন্ন শ্লোক, বাণী ও গানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। গুরু নানক-সহ পরবর্তী শিখগুরুদের বাণী শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'গুরু গ্রন্থসাহিব'-এ সংকলিত হয়েছে। শিখ গুরু ছাড়াও গুরু গ্রন্থসাহিবে নামদেব, জয়দেব, রবিদাস, সুরদাস, কবীর-সহ ভক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন সন্তদের বাণীকে স্থান দেওয়া হয়েছে। বহু ভক্তি সাধকদের বাণীকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থে স্থান দিয়ে বেদমন্ত্র 'একম্ সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'র বাস্তবিক প্রয়োগ করা হয়েছে। গুরু গ্রন্থসাহিবে বেদ, হরি, রাম, পরব্রহ্ম, যম, ধর্মরাজ, বৈকুণ্ঠ, নির্বাণ, তুরীয় অবস্থা ইত্যাদি শব্দের বহু ব্যবহার পাওয়া যায়। শিখ উপাসনা পদ্ধতির দার্শনিক ভিত্তি উপনিষদেই পাওয়া যায়। মাণ্ডুক্য উপনিষদের দুটি পাখির গল্প পাওয়া যায় যাদের মধ্যে একটি সাংসারিক সুখ ভোগ করে কিন্তু অন্য পাখিটি সাংসারিক সুখ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখে নির্বাণ লাভ করে-- সেই একই উদাহরণ গুরু গ্রন্থসাহিবেও পাওয়া যায়। গুরু গ্রন্থসাহিবে মানবদেহেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের অধিষ্ঠানের কথা (পৃষ্ঠা ৭৫৪) বলা হয়েছে অর্থাৎ মাণ্ডুক্য উপনিষদের 'তত্ত্বমসি ব্রহ্ম' মন্ত্রটিই যেন উচ্চারিত হয়েছে।

গুরু নানক-সহ দশজন শিখ গুরু নিজেদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মাধ্যমেই ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির মূল দর্শনটিকে পুনরায় উচ্চারিত করেছিলেন। সেবা ও ব্যক্তিগত সংস্কার সাধনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চিরাচরিত ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে জোরপূর্বক ধর্মান্তরণে বিশ্বাসীদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী ছিল। ১৫২৪ সালে বাবর লাহোর আক্রমণ করে লুঠতরাজ চালায় এবং সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করে। সেই সময়ের ধ্বংসলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন গুরু নানক। তিনিও বন্দি হন বাবরের সেনার হাতে। গুরু গ্রন্থসাহিবের চারটি শ্লোকে গুরু নানক নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। ব্যথিত গুরু নানক সর্বশক্তিমানের উদ্দেশে 'বাবর বাণী' নামে খ্যাত সেই শ্লোকে বলেছেন, 'স্রষ্টা হিন্দুস্থানকে আতঙ্কিত করার জন্য মুঘল বাহিনীকে মৃত্যুর দূত হিসেবে প্রেরণ করতে বেছে নিয়েছেন। হানাদারদের নিপীড়নের শিকার মানুষের আর্তনাদ শুনে কি তোমার সহানুভূতি হয়নি? আর এই অমূল্য দেশ ধ্বংস করা হয়েছে। হে সৃষ্টিকর্তা! তুমি সকলের প্রভু। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কোনো শক্তিমান আক্রমণ করলে তা কারোর জন্য দুঃখের কারণ হতে পারে না কিন্তু যদি একটি হিংস্র বাঘ ভেড়ার পালকে আক্রমণ করে এবং তাদের হত্যা করে, তবে তার জন্য প্রভুকে অবশ্যই উত্তর দিতে হবে।'

ঈশ্বরবিশ্বাসী গুরু নানক তাঁর চতুর্থ শ্লোকে বিধাতার বিচারের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে বাবরের পতনের সঠিক সময় উল্লেখ করে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন। তাঁর তিরোধানের আট মাস পরেই হুমায়ুন শেরশাহের হাতে পরাজিত হয়ে পালাতে বাধ্য হয়। গুরু নানক যে ভক্তি, সেবা ও একাত্মতার পথ সমাজকে দেখিয়েছিলেন, সেই পথেই সমাজ আপন ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষার্থে শক্তি সঞ্চয় করেছিল। সনাতন সংস্কৃতিকে বাঁচাতে গুরু তেগ বাহাদুর, গুরুগোবিন্দ সিংহ এবং অন্যান্য শিখ গুরুদের আত্মবলিদান অবিস্মরণীয়।

চতুর্থ শিখগুরু রামদাস গুরু নানকের ইচ্ছানুযায়ী একটি সরোবরের সংস্কারসাধন করেন। তার নাম হয় অমৃতসর। এই অমৃতসরকে কেন্দ্র করে ১৫৭৪ সালে রামদাস হরমন্দির সাহিব স্থাপন করেন যা পাঠানরা ধ্বংস করে দেয়। পরে ১৮০২ সালে মহারাজা রঞ্জিত সিংহ সেখানে স্বর্ণমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। গুরু নানক কর্তারপুরে ফিরে এসে জীবনের বাকি সময় এখান থেকেই তাঁর ধর্মমত প্রচার করতেন। একেশ্বরবাদী হলেও ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃতি থেকে সৃষ্ট অন্যান্য ধর্মমতের মতোই শিখ উপাসনা পদ্ধতি পরমত সহিষ্ণু। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুঘলদের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রায় ১০০ বছর সরাসরি লড়াই করতে হয়েছিল।

এই লড়াইয়ে মুঘলদের প্রতিহত করে শিখ সম্প্রদায় ভারতীয় সংস্কৃতিকে সফলভাবে রক্ষা করতে পেরেছিল। বর্তমান ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা রক্ষায় গুরু নানকের মত ও তার দার্শনিক ভিত্তির পুনঃস্মরণ একান্ত জরুরি। ■

স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গিতে শিখ সম্প্রদায় হিন্দুধর্মেরই উত্তরাধিকারী

কল্যাণ গৌতম

শিখ মতাদর্শকে নতুন ধর্মপ্রচার না বলে স্বামীজীর ভাষায় বলা উচিত, 'আধুনিককালে দয়াল নামক তাঁর অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন।' অর্থাৎ নানকের ভাবপ্রচার হচ্ছে সনাতন হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তর থেকে উৎসারিত একটি প্রেমপ্রবাহ; আলাদা ধর্ম নয়। স্বামীজী দেখেছেন দক্ষিণেশ্বরে নানকপন্থী সাধুরা আসতেন শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে। বহু শিখ ঠাকুরকে 'নানক' জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। এদিকে স্বামীজীর শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতাকে উচ্চৈঃস্বরে বলতে শোনা যেত, 'ওয়া গুরুজী কী ফতে। বোল্ বাবুজী কী খালসা।' স্বামীজীর উপর যেন দায় বর্তালো হিন্দু-শিখ সমন্বয়-নদীতে জোয়ার আনতে।

শিখ মতাদর্শের সঙ্গে সমালোচনার দিন যে নেই; এখন যে গড়ার জন্য অপেক্ষা, অনন্তকালের জন্য কাজ আর উন্নতির চেষ্টা, সেটা অনুভব কারানোর দায় বর্তালো স্বামীজীর উপর। স্বামীজীকে লাহোরে গুরু নানক সম্পর্কে বলতে দেখা যায়, 'এখানেই সেই মহাত্মা তাঁর প্রশস্ত হৃদয়ের দ্বার খুলে এবং বাহু প্রসারিত করে সমগ্র জগৎকে— শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানদেরও পর্যন্ত আলিঙ্গন করতে ছুটে গিয়েছিলেন।' কথাটির মধ্যে ধর্মান্তরকরণ রোধ হওয়ার বার্তা যেমন আছে, আর আছে পরাবর্তন বা ধর্মান্তরিত হিন্দুদের কাছে পুনরায় ফিরে আসার আশায় ছুটে যাওয়া।

স্বামী বিবেকানন্দ লাহোরে ধ্যান সিংহের হাবেলিতে পঞ্চনদের সন্তানদের সামনে শিকাগো বিজয়ের পর ১৮৯৭ সালে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে কী কী বিভিন্নতা আছে তা প্রকাশ করবার জন্যে আমি এখানে আসিনি। এসেছি আমাদের মিলনভূমি কোথায় তাই অন্বেষণ করতে। কোন ভিত্তি অবলম্বন করে আমরা চিরকাল সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ থাকতে পারি। কোন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে যে বাণী অনন্তকাল ধরে আমাদের আশার কথা শুনিয়ে আসছে, তা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে পারে, তা বোঝার চেষ্টা করতে আমি এখানে এসেছি।' স্বামীজীর বক্তব্যের বিষয় ছিল 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি। এই বক্তব্যে তিনি গুরু নানক এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের মহত্ত্ব প্রসঙ্গ উত্থাপন করে শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দুধর্মের অন্যান্য সম্প্রদায়ের একত্ব ও মিলনের সূত্র নিয়ে কথা বলেন। বলেন প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থের ঘোষণা 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। জগতে এক বস্তুই রয়েছে, ভারতীয় ঋষিরা তাঁকে বর্ণনা করেছেন নানা ভাবে।

> স্বামীজী নিশ্চয়ই বলেছেন, সমগ্র বিশ্বে একটি ধর্ম কখনই থাকতে পারে না। তিনিই বলেছেন, কোনো ধর্মকেই ঘৃণা করা উচিত নয়। সেই তিনিই আবার যখন শিয়ালকোটে 'ভক্তি' বিষয়ক বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন, 'যে ধর্ম অন্যায়-কাজের পোষকতা করে সেই ধর্মের প্রতিও কি সম্মান দেখাতে হবে? এর উত্তর 'না' ছাড়া আর কী হতে পারে? এই সব ধর্ম যত শীঘ্র দূরীভূত করা যায় ততই মঙ্গল। কারণ ওই ধর্মের দ্বারা লোকের অকল্যাণই হয়ে থাকে।'

স্বামীজী তাঁর লাহোর বক্তৃতার শুরুতে লাহোরের 'পবিত্রতম ভূমি', 'বীরভূমি'-র ভূয়সী প্রশংসা করেন। লাহোর সেই ব্রহ্মাবর্ত, যার সম্পর্কে মহারাজ মনুও বলেছিলেন। লাহোরের ভূমি থেকেই একদা আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ প্রবলভাবে জন্ম নেয়। 'এই সেই বীরভূমি— যা যতবার এই দেশ অসভ্য বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে, ততবারই বুক পেতে প্রথমে সেই আক্রমণ সহ্য করেছে।' দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি মহান গুরুগোবিন্দ সিংহের নাম উচ্চারণ করলেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। স্বামীজীর অনুভবে এই নির্যাতন স্বীকার করার মূল কারণ ছিল হিন্দুনামধারী যে কোনো ব্যক্তির দুঃখকষ্ট তাঁর হৃদয় স্পর্শ করা। তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন; আর তার জন্যই সর্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করতে প্রস্তুত

হয়েছিলেন।

লাহোর বক্তৃতায় মহান গুরুগোবিন্দ সিংহ সম্পর্কে স্বামীজী পরিষ্কার করে বলছেন, ‘এই মহাত্মা দেশের শত্রুগণের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য নিজের শোণিতপাত করলেন, নিজের সন্তানদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করতে দেখলেন। যদি আমরা দেশের হিতসাধন করতে চাই তাহলে আমাদের প্রত্যেককেই এক একজন গোবিন্দ সিংহ হতে হবে। আমাদের মধ্যে যিনি এমনি করতে পারবেন তিনিই হবেন হিন্দু নামের যোগ্য। আমাদের সামনে সর্বদাই এই রকম আদর্শ থাকা প্রয়োজন। পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ভুলে গিয়ে চারিদিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করতে হবে।’ তার মানে দেশের শত্রু হিসেবে তিনি শাসক মুঘলদের বুঝিয়েছেন এবং ইসলামের বিপ্রতীপে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য রক্তদানের কথা বলেছেন। সরাসরিই বলেছেন যে গুরুগোবিন্দ সিংহ একজন যোগ্য হিন্দু। ভয়ংকর অহিন্দু শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত সকল সম্প্রদায়কে বিরোধ ভুলে একত্রিত হতে হবে। তাদের মধ্যে হাজার রকমের দোষ থাকলেও, যাদের মধ্যে ‘হিন্দুরক্ত’ আছে, প্রেমের বাণী প্রয়োগ করে একত্রিত করতে হবে। দেখা যাচ্ছে বহুধা বিদীর্ণ ধর্মীয় মতবাদের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনে অনন্য প্রয়াস-সাধনে হাত দিয়েছেন বীর সন্ন্যাসী। শিখ গুরুর মতোই তিনিও বীর।

তখন স্বামীজীর শরীর গেছে। ১৯০৩ সালের গ্রীষ্মকাল, মেদিনীপুর পৌঁছেছেন ভগিনী নিবেদিতা। দেশপ্রেমী যুবকেরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘হিপ্ হিপ্ হুররে’। ‘না, না,’ বারণ করে উঠলেন ভগিনী নিবেদিতা। ‘এটা ইংরেজ জাতির বিজয়োল্লাস, ভারতীয়দের তা কিছুতেই ব্যবহার করা উচিত নয়, কখনই নয়।’ হাত তুলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে তিনবার বললেন— ‘ওয়া গুরুজী কী ফতে। বোল্ বাবুজী কী খালসা।’ গুরুর জয়, গুরুদেবের জয়, তিনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন, তারই কৃপায় রক্ষা পেয়েছি। একদা এই ধ্বনি বীরত্বের লীলাভূমি পঞ্জাবে বীরেন্দ্র দেশপ্রেমিক শিখেরা দিক্‌মণ্ডল কম্পিত করে উচ্চারণ করত মোগল শিখের রণে।

বহু শিখপন্থী সাধু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনায় অংশ নিতেন। ১৮৮৩ সালের ২১ ডিসেম্বরের দিন উল্লেখ করে কথামৃতে রয়েছে, ‘অপরাহ্নে নানকপন্থী সাধু আসিয়াছেন। হরিশ, রাখালও আছেন। সাধু নিরাকারবাদী। ঠাকুর তাঁহাকে সাকারও চিন্তা করিতে বলিতেছেন।’ (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম খণ্ড)। অনেক সময় পঞ্চবটীর তলায় এসে বসে থাকতেন নানকপন্থী সাধুরা। ঠাকুরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল বহু শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের। যোগাযোগ ছিল চানক বা বর্তমান বারাকপুর পল্টনের সিপাই কুঁয়ার সিংহের সঙ্গে। তিনি ঠাকুরকে ‘নানক’ জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। ঠাকুরের মধ্যে ছিল সকল ধর্মের, সকল ধারার, সকল পন্থার বিকাশ! চানকের শিখ ও অন্যান্য সিপাইদের ঠাকুর আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েছেন, অভ্যাস যোগ করতে বলেছেন। এইভাবেই হিন্দু-শিখ ধর্মকে কাছাকাছি এনে ফেলছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এর প্রভাব প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের উপরও পড়েছিল।

বছর চারেক আগে ভারতব্যাপী গুরু নানকের ৫৫০তম আবির্ভাব বর্ষকে কেন্দ্র করে হিন্দু-শিখ নৈকট্য ও সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তার পথিকৃৎ শ্রীরামকৃষ্ণ— স্বামীজী ও নিবেদিতার প্রাসঙ্গিকতা তাই এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা গেল। সকলেই ‘ভাই-ভাই’ এই সাম্যবাদ প্রচার করে গিয়েছিলেন নানক নিরহংকারী। অতীতের অন্ধকারকে হরণ করে উজ্জ্বলতার কথা বলেছেন তিনি। নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্যের মতো মহাত্মাদের আবির্ভাব কেন গুরুত্বপূর্ণ— তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়— ‘যদি তাঁহারা এই শিক্ষা প্রচার না করিতেন, তাহা হইলে উত্তর ভারতে আরও অনেক লোকে নিশ্চয় মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিত।’ অর্থাৎ সমকালীন

রাজনৈতিক-সামাজিক- ধর্মীয় পরিবেশে এই সম্বনয় না হলে আরও হিন্দু ধর্মান্তরিত হতেন এবং ‘হিন্দু রক্ষীদল’-এর প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন, ‘গুরুগোবিন্দ কোন আদর্শে খালসা শিখ গড়েছিলেন? গুরুর আদেশে সর্বস্ব ত্যাগে, জীবন ত্যাগে আগ্রহান্বিত থাকবে— এই ছিল তাঁর প্রেরণা ও শিক্ষা। তাইতো মারহাটা ও শিখ জাতি দুর্জয় হয়ে উঠেছিল। সেই আদর্শ পরিত্যাগ করে যখন তারা অর্থলিপ্সু ও প্রভুত্বপ্রিয় হয়ে উঠলো, তখনি হলো তাদের পতন; এই ভাব ও আদর্শ হিন্দু-জনসাধারণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে।’

মানুষ সুযোগ সুবিধা পেতে তার রাজার ধর্ম গ্রহণ করে থাকেন; তরবারির সাহায্যেও রাজা তার প্রজাকে আপন ধর্মের অনুসারী হতে বাধ্য করেন। সামাজিক-ধর্মীয় পরিস্থিতিতে যদি উপযুক্ত সংস্কার সাধন না হয়, তবে মানুষ আপন ধর্ম থেকে পলায়ন করতেও দ্বিধা করেন না। নানক তাঁর সময়ে হিন্দুত্ব ছেড়ে ইসলাম গ্রহণে স্বয়ং বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন

শিখপন্থার নামে। ভারতবর্ষকে এখন বুঝতে হবে শিখপন্থা হিন্দুত্বের বৃহত্তর আধার বই কী নয়। খ্রিস্টান আর মুসলমানেরা তাদের ধর্মপ্রচারের সুবিধার্থে বুঝিয়ে গেছে; তাদের দোসর বামৈস্লামিক সেকুলার শক্তি সহজে বুঝিয়ে গেছে— তুমি বৌদ্ধ তুমি আলাদা; তুমি জৈন, তুমি হিন্দু নও, তুমি আলাদা; তুমি শিখ, তাই অবশ্যই হিন্দুদের থেকে আলাদা; তারপর হিন্দুদের মজ্জার মধ্যেও বিভাজন ঢুকিয়ে গেছে— তুমি তপশিলি জাতি, তুমি আলাদা; তুমি তপশিলি উপজাতি, তুমিও ভিন্ন; তুমি ওবিসি, কাজেই আলাদা। নানানভাবে হিন্দুত্বকে দুর্বল করার এক বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে কাজ করে চলেছে ধর্মান্তরকরণের কারিগরেরা। আজ তারই বিপ্রতীপে আমাদের বুঝতে হবে কোথায় আমাদের মিল, কোথায় বৌদ্ধ-হিন্দু- মিলনসূত্র, কোথায় শিখ-হিন্দু অভিন্ন, কোথায় জৈনতে-হিন্দুতে একাকার।

স্বামীজী নিশ্চয়ই বলেছেন, সমগ্র বিশ্বে একটি ধর্ম কখনই থাকতে পারে না। তিনিই বলেছেন, কোনো ধর্মকেই ঘৃণা করা উচিত নয়। সেই তিনিই আবার যখন শিয়ালকোটে 'ভক্তি' বিষয়ক বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন, 'যে ধর্ম অন্যায়-কাজের পোষকতা করে সেই ধর্মের প্রতিও কি সম্মান দেখাতে হবে? এর উত্তর 'না' ছাড়া আর কী হতে পারে? এই সব ধর্ম যত শীঘ্র দূরীভূত করা যায় ততই মঙ্গল। কারণ ওই ধর্মের দ্বারা লোকের অকল্যাণই হয়ে থাকে।' (স্বামীজীর শিয়ালকোটে প্রদত্ত বক্তৃতা, বিষয়— ভক্তি; সূত্র : বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৭৬৮)

স্বামীজী বলেছিলেন, 'বর্বর জাতির আক্রমণ-তরঙ্গ বারবার আমাদের এই জাতির মস্তিষ্কের ওপর দিয়ে চলে গেছে। শত শত বছর ধরে 'আল্লা হো আকবর' রবে ভারতের আকাশ মুখরিত হয়েছে। আর সেই সময় এমন কোনো হিন্দু ছিল না যে প্রতি মুহূর্তে নিজের বিনাশের আশঙ্কা করেনি।' (লাহোরে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতা, বিষয় : হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি, তথ্যসূত্র : ঐ, পৃ. ৭৭১)। শিখপন্থার মানুষের কাছে স্বামীজীর বার্তা ছিল, 'যদি পারি তাহলে আমাদের পরস্পরের মিলনভূমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করব। এবং যদি ঈশ্বরের কৃপায় এ সম্ভব হয় তাহলে ঐ তত্ত্ব কাজে পরিণত করতে হবে।' শিখ-হিন্দু সমন্বয়ের কাজটি তাই ত্বরান্বিত করতে গুরু নানকের আবির্ভাব দিবসটি উদ্‌যাপন এক অনন্য রূপ ও সৌকর্য দিতে পারে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ--- এই চারটি ধর্মের উৎসভূমি ভারতবর্ষ। আলাদা ধর্ম বলা হলেও তা যে আদতে একই ধর্মের কুসুমোদ্যানে প্রস্ফুটিত পৃথক পৃথক ফুল— সেই শাশ্বত সত্যটি প্রকাশ করাই বর্তমান ভারতে একান্তভাবে জরুরি হয়ে পড়েছে। গুরু নানকের জন্মদিন উদ্‌যাপন তারই ভাবনায় অন্বিত। নানকের ধর্মীয় অবস্থান হিন্দুদের কাছে এক অবিসংবাদী সংস্কারকের। শিখধর্মের শিক্ষা হলো একেশ্বর, গুরু এবং নামজপের। প্রচলিত সংস্কার মুক্ত শিখধর্মে মূর্তিপূজায় প্রশ্রয় নেই, তার নির্যাস হিন্দুধর্মের নির্গুণ ব্রহ্মবাদেও আছে।

দয়াল নানকে বলা হয় গুরু নানক। 'গুরু' কে? তার উত্তরে স্বামীজী; বলেছেন— গ্রন্থকীট, বৈয়াকরণ বা সাধারণ পণ্ডিতগণ গুরু হওয়ার যোগ্য নন। 'যথা খরশ্চন্দনভারবাহী, ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য'। চন্দন ভারবাহী গাধা চন্দনের ভারই জানে, চন্দনের গুণাবলি সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এই পণ্ডিতেরাও সেইরকম। প্রকৃত গুরু পরের হিত করেন, প্রতিদানে কিছুই চান না। নানকের ধর্মমত পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় গুরুর থাকবে অনন্ত রত্নরাজি— উপাসনা, দান, শুচিতা, সংযম, নম্রতা, দয়া, বিশ্বাস এবং সর্ব-সংস্কারমুক্ত হৃদয়। হিন্দু ধর্মের এই মহান ব্যক্তিত্বকে শতকোটি প্রণাম।

তথ্যসূত্র :

১. বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, অখণ্ড বাংলা সংস্করণ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২১তম মুদ্রণ, ১৯৯৩, পৃ. ৭৭০-৭৭৬)

২. শ্রীশ্রীযুগাচার্য জীবন-চরিত, স্বামী বেদানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৪২৬, পৃ. ২৮৩।

সনাতন ভারতের গুরু পরম্পরার উত্তরাধিকার— শিখপন্থ

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

ফোনে প্রশ্নটা করেছিল কর্মসূত্রে কানাডায় থাকা আমার এক বাল্যবন্ধু তুহিন। বলে— শিখরা কি আদৌ দেশভক্ত? তারা কি সত্যিই দেশকে ভালোবাসে? কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলাম। দুই বন্ধু ছোটোবেলা থেকে এমন এক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় যেখানে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন— ভারতে সৃষ্টি হওয়া সব পন্থ সম্প্রদায়ের প্রতি তৈরি হয়েছে গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা। কিন্তু আজ তুহিনের কথায় একটু অবাকই হলাম। ফিরিয়ে প্রশ্ন করি— আজ তোর হঠাৎ এমন মনে হলো কেন? সে বলে— এ কারণেই যে বিগত কয়েক বছরে এই সম্প্রদায়ের মানুষজন দেশে-বিদেশে এমন এমন কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে চলেছে তাতে এমন প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। তার প্রত্যুত্তরে একটু নড়েচড়ে বসি। সে বলে— ৮০-র দশকে জার্নেল সিংহ ভিন্দ্রানওয়ালের কথা বাদই দিলাম। তখন ছোটো ছিলাম অতশত বুঝতাম না। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৃষক আন্দোলনের নামে দেশভাঙার ষড়যন্ত্রীদের যে তাণ্ডব দেখলাম, সঙ্গে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের যে হুংকার, তাতে এই আমার এই ধারণা প্রকট হয়েছে। ২০২২ সালের ২৬ জানুয়ারি, গণতন্ত্র দিবসের পুণ্যদিনে দিল্লির লালকেল্লার ওপরে ২১ বছরের যুগরাজ সিংহ যখন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার অপমান করে তার পাশে 'নিশান সহিব' উড়িয়েছিল তখন কি শিখ সমাজের বৃহত্তম অংশ এর প্রতিবাদ করেছিল? ভারতের জাতীয় পতাকার অপমান শিখদের অপমান নয়? এদেশের অপমান নয়? সেদিন ক'জন শিখ এর প্রতিবাদে পথে নেমেছিল? আবার, গত সেপ্টেম্বরে কানাডায় ভারত-বিরোধী চক্রের সঙ্গে যুক্ত এক শিখের গুপ্তহত্যার দায় চাপিয়ে কানাডা সরকার যখন ভারতের বদনাম করার চেষ্টা করল তখন কানাডায় বাস করা হাজার হাজার শিখ কোথায় ছিল? ভারতই তো তাদের জন্মভূমি, তাই না? নিজের জন্মভূমির অপমানে তারা নিশ্চুপ ছিল কেন? এমনকী ভারতের শিখরাও এর বিরুদ্ধে তেমন সোচ্চার হননি। তবে বল, এরা যে ভারতপ্রেমী দেশভক্ত এর প্রমাণ কী?

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম তার আগেই আমাকে থামিয়ে সে বলে— শেষ কথাটা শুনে নে, গত দুদিন আগে এই

কানাডায় বসে খালিস্তানি নেতা গুরপতবন্ত সিংহ পান্নু বলেছে ১৯ নভেম্বর ২০২৩ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ দেখার জন্য কোনো দেশ থেকে কেউ যেন এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনে না চাপে। তাহলে তারা মারা পড়বে। অর্থাৎ কানাডায় নিশ্চিন্তে বসে একজন পাগড়িধারী শিখ হুমকি দিচ্ছে ভারতে গেলে মরতে হবে। এ তো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ! বিদেশের কাছে ভারতকে অসহায়, দুর্বল বলে প্রমাণিত করা। এই হুমকির পরে ক'জন শিখ এই উগ্রপন্থীর তীব্র ভর্ৎসনা করেছে? কতজন শিখ নেতা পান্নুকে ধর্মদ্রোহী, শিখ সম্প্রদায়ের কলঙ্ক বলে ঘোষণা করেছেন? একজনও না। তবে আমি কীভাবে মনে করব এর পেছনে এই সম্প্রদায়ের নিঃশব্দ সমর্থন নেই?

তুহিনের প্রশ্নবাণে বাক্যহারা হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর ধাতস্থ হয়ে বলি, তোর প্রশ্নে হয়তো যুক্তি আছে। এই দেশবিরোধী খালিস্থানি উগ্রবাদীদের অপকর্মের জন্য সম্পূর্ণ শিখ সমাজ হয়তো প্রবল ভাবে প্রতিবাদে মুখর হতে পারেনি কিন্তু তারা সকলে দেশভক্ত নয় এটা মনে করা ঠিক নয়। আচ্ছা, তোর জানা আছে ২০১৬ সালে দিল্লির জেএনইউ-তে ছাত্রনেতা কানাইয়াকুমার, অনির্বাণ ভট্টাচার্যরা স্লোগান তুলেছিল— 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে...জঙ্গ বহেগী ভারতকী বরবাদী তক্', অথবা আমাদের কলকাতার গর্ব যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে সেই অনির্বাণ-কানাইয়ার সমর্থনে স্লোগান উঠেছিল 'হামে চাইয়ে আজাদি, ভারত সে মিলে আজাদি' সেদিনও কিন্তু বাঙ্গালি সমাজ এর প্রতিবাদে পথে নামেনি। তার মানে কি আমরা ধরে নিতে পারি সম্পূর্ণ বাঙ্গালি সমাজ বিচ্ছিন্নতাবাদে মদত দিচ্ছে? তারা দেশদ্রোহী?

আসলে ব্যাপারটা মোটেই ওরকম নয়। এই ভিন্দ্রানওয়ালে, পান্নু, অনির্বাণ, কানাইয়া— এরা সকলেই এক সুতোয় গাঁথা মালা। আর সেই সুতোটির নাম হলো 'ইসলামি কট্টরবাদ'। যে চক্রান্ত শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর

যে শিখপন্থ তৈরি হয়েছিল হিন্দুধর্মের বর্ণভেদ, জাতিভেদ, আচার সর্বস্বতাকে দূর করে ধর্মকে পরিশুদ্ধ করার জন্য— সে আজ দুষ্ট রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে নিজেই কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। দশ গুরুর সারা জীবনের সাধনা, পাঁচ গুরুর আত্মাহুতি, স্বধর্মরক্ষায় হাজার হাজার শিখের বলিদান— সবকিছু ভুলে কিছু পথভ্রষ্ট শিখ শত্রুদেশের অঙ্গুলিহেলনে দেশ ভাঙতে তৎপর হয়েছে।

আগে এদেশে ইসলামি শাসনকালে। তাদের উত্তরসূরিদের আজ আফশোস যে, এক হাজার বছরের শাসনেও তারা সনাতন ভারতকে আল্লার শাসনে আনতে পারেনি। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশকে তারা পাক-স্থান বানাতে পারলেও অবশিষ্ট ভারত না-পাকই থেকে গেছে। তাই তারা এদেশের কিছু লোভী, স্বার্থান্বেষীকে দেশবৈরিতা শিক্ষা দিয়ে পুনরায় এদেশকে ভাঙতে উদ্যত হয়েছে।

এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই আজ থেকে ৮০০ বছর আগে স্থাপনা হয়েছিল শিখপন্থের। ১৪৬৯ সালে নানকান সাহিব (বর্তমান পাকিস্তান) আবির্ভাব হয়েছিল শিখপন্থের প্রতিষ্ঠাতা নানকদেবের। ইসলামি শাসনকালে একদিকে তীব্র জাতিভেদ, অপরদিকে মুসলমান হওয়ার প্রলোভনে পড়ে হিন্দুরা যখন দিশেহারা, অসহায়, সেই সংকটময় মুহূর্তে জাতপাতহীন সৌভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিখ পন্থের, যেমন করে এই বঙ্গপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যদেব দলে দলে হিন্দুর ইসলামিকরণ রুখতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বৈষ্ণব মতের। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ধর্মের মলিনতা দূর করতে, জাতিভেদের গ্লানি মুছে দিতে যেমন করে বৌদ্ধমত, জৈনমতের প্রবর্তন করেছিলেন ভগবান বুদ্ধ ও মহাবীর, ঠিক সেভাবেই।

নানকদেবও ভারতের সনাতন ধর্মের পরিশুদ্ধকরণের কাজই শুরু করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর অবর্তমানে এই কাজ যাতে থেমে না যায় তার জন্য প্রবর্তন করলেন গুরু পরম্পরা। তাঁর থেকে শুরু হয়ে গুরুগোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত দশজন গুরুর এক অবিরল ধারা এই সমাজকে সতত ঈশ্বর সাধনা ও আপন ধর্মে অবিচল নিষ্ঠাবান থাকার প্রেরণা জুগিয়েছিল। গুরুনানক, গুরু অঙ্গদ, অমর দাস, রাম দাস, অর্জুনদেব, হরগোবিন্দ, হররাই, হরকৃষ্ণ, তেগবাহাদুর, গুরুগোবিন্দ সিংহ— এরা সকলেই হিন্দু গুরু পরম্পরার এক প্রবহমান ধারা। সর্বগ্রাসী ইসলামি শাসনে হিন্দু সমাজকে হিন্দু হয়ে বেঁচে থাকার সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছিলেন তাঁরা। গুরুগোবিন্দ সিংহ সমাজ রক্ষায় প্রবর্তন করেছিলেন খালসা পন্থ। তাদের দিয়েছিলেন 'পঞ্চ-ক' (কেশ, কচ্ছ, কড়া, কঙ্গন, কৃপাণ) ধারণের উপদেশ। পরিবারের একজন পুরুষ সদস্য খালসা হিসেবে 'পঞ্চ-ক' ধারণ করে হাতে কৃপাণ অর্থাৎ তরবারি নিয়ে সর্বদা আপন ধর্ম রক্ষায় সজাগ থাকবে— এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। তাঁর হাত ধরেই শিখ জাতি যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

তুহিন বলে, তোর সব কথাই ঠিক, কিন্তু শিখ সমাজ যে হিন্দু ধর্মরক্ষায় তৈরি হয়েছিল, হিন্দু ধর্মেরই একটি উপাসনা পদ্ধতি তা তারা মানছে কই? তারা তো হিন্দুদের সঙ্গে বিবাদে মত্ত। আমি বলি— এটাই তো ছিল ব্রিটিশের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসি। পরে এদেশের রাজনীতিবিদরাও ক্ষমতার স্বার্থে তাতে মদত

দিয়ে চলেছে। কিন্তু আজও অল্প কিছু পথভ্রষ্ট ছাড়া বাকি শিখ সমাজ হিন্দুত্ব দর্শনকেই নিজেদের দর্শন বলে মানে। আচ্ছা, তুই গুরু নানকজীর কথাই ধর। তিনি ৩০ বছর সাধনা করে সিদ্ধিলাভ হওয়ার পর ১৫ বছর ধরে সারা দেশের সব হিন্দু তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছেন, মাথা ঠেকিয়েছেন। শুধু কি তাই— বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের বাণীর মাধ্যমে শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের দশ গুরুর মধ্যে কারও নাম গুরু রামদাস, অর্জুনদেব হরগোবিন্দ, আবার কারও নাম হররাই, হরকৃষ্ণ, গুরুগোবিন্দ— আচ্ছা, এই নামগুলি সবই হিন্দু দেবদেবীর নামে কিনা?

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বভূতে বিরাজমান, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা, মানব সেবাই ঈশ্বর সেবা— শিখ গুরুদের এই বাণীগুলি কি হিন্দুধর্মের চিরায়ত কথা নয়? শিখ শব্দের অর্থ তো 'শিষ্য'— নিরন্তর গুরুর কাছ থেকে জ্ঞানার্জন। গুরু নানকজী বলেছিলেন--- ঈশ্বর সাধনার জন্য বনেজঙ্গলে, গুহা কন্দরে, নির্জনে যাওয়ার দরকার নেই; সংসারে থেকে গৃহী হয়েও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এ তো হিন্দু ধর্মেরই সার কথা--- আর আমাদের দেশের মুনি-ঋষি, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেবও পথ দেখিয়ে গেছেন। দশমগুরু গোবিন্দ সিংহ মৃত্যুর আগে ব্যক্তিগুরু পরম্পরার অবসান ঘটিয়ে যে প্রতীক গুরু 'গুরুগ্রন্থ সাহিব' আমাদের দিয়ে গেলেন তাতে যে ৫৮৭৭টি শ্লোক আছে, সে তো হিন্দু ধর্মগ্রন্থেরই নির্যাস।

হিন্দু সন্ত নামদেব, সুরদাস, রবিদাস, কবীর এঁদের বাণীও সংবলিত সেখানে। এর থেকেই কি প্রমাণিত হয় না শিখ কোনো নতুন ধর্ম নয়, হিন্দু ধর্মেরই এক নবতম সাধনার মার্গ মাত্র?

তুহিন বলে, সে না হয় বুঝলাম কিন্তু এদের একটা অংশই তো আজ ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে মিলে এদেশকে ভাঙতে উদ্যত। আমি বলি, এরা সকলেই অনির্বাণ, কানাইয়ার মতো পথভ্রষ্ট। একবার ভেবে দেখ ইসলামি শাসনে হিন্দুধর্ম রক্ষায় এরা কী বলিদানটাই না দিয়েছে। দশজন শিখগুরুর মধ্যে পাঁচজনই ধর্ম প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। গুরু অর্জুনদেব ইসলাি;ম গ্রহণ না করার কারণে জাহাঙ্গিরের নির্দেশে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করে মৃত্যুবরণ করেছেন। গুরু হরগোবিন্দ জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছেন। গুরু হরকৃষ্ণ ও তেগবাহাদুর ঔরঙ্গজেবের আদেশে নির্মম অত্যাচার সয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। গুরু গোবিন্দ সিংহও ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃত হয়ে তরবারির আঘাতে বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছেন। আর তাঁর দুই বালক পুত্র বারো ও চোদ্দ বছরের ফতে সিংহ, জোরাবর সিংহ ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়ে দিল। রবীন্দ্রনাথের 'বন্দিবীর' কবিতার উপজীব্যও তো বীর বান্দা বৈরাগী এবং তাঁর শিশুপুত্রের ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গের অমর কাহিনি। ইসলামি শাসকেরা গুরু তেগবাহাদুরের তিন শিষ্য ভাই মোতিদাসকে দাঁড় করিয়ে করাত দিয়ে জ্যান্ত চিরে হত্যা করেছে। ভাই দয়াল দাসকে ফুটন্ত তেলের কড়াইতে ডুবিয়ে মেরেছে, ভাই সতীদাসকে সারা শরীরে তুলো জুড়িয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে— তবু এরা কেউ ধর্ম বিসর্জন দেননি। স্বদেশ ও স্বধর্ম রক্ষায় শিখেদের সেই আত্মত্যাগের ইতিহাস কি এই দু' একটা বিশ্বাসঘাতক ধর্মদ্রোহী ভিন্দ্রানওয়ালে, যুগরাজ সিংহ আর পান্নুর জন্য দেশ ভুলে যাবে?

আমার উত্তরে বন্ধু কিছুটা আশ্বস্ত হয়। বলে, দেশের জন্য এত বলিদান আত্মত্যাগ যাদের, যারা জাতপাতহীন বর্ণহীন সমাজ গড়ার জন্য সাধনা করে গেলেন তাদের মধ্যেও তো আজ শুনি উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ। তারা আজ জাতপাতে বিভক্ত কেন? শুনেছি পঞ্জাবে আজ ৩১ শতাংশ সিডিউল কাস্ট? আমি বলি ঠিক বলেছিস। যে বর্ণভেদহীন সমাজ গড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শিখপন্থ তৈরি হয়েছিল, যে গুরুদ্বারার 'লঙ্গরখানায়' সমস্ত বর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে পাশাপাশি মাটিতে বসে প্রসাদ গ্রহণ করে, গুরুগোবিন্দ সিংহের অনুরোধে যারা নিজের আগেকার পদবি বর্জন করে পুরুষেরা সকলে 'সিংহ' ও মহিলারা 'কৌর' বলে নিজেদের পরিচয় দেন, ধর্মরক্ষায় সব বর্ণের মানুষকে নিয়ে একজন ক্ষত্রিয়, একজন কৃষক, একজন জলবাহক, একজন দর্জি ও একজন নাপিতকে নিয়ে পঞ্চপ্যারে 'খালসা' পন্থের প্রতিষ্ঠা করেন— সেই শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন ঘৃণিত কাস্ট সিস্টেম সত্যিই দুঃখের।

আসলে এ ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ অনুকূল্যে পালিত খ্রিস্টান মিশনারিদের চক্রান্ত, ঠিক যেমন ভাবে মেকলের মস্তিষ্কপ্রসূত আদিবাসী, বহিরাগত তত্ত্বে এদেশের হিন্দুরা আজও শতধা বিভক্ত। আজ পঞ্জাবে 'ডেরা' নামে এক নতুন শিখ গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। রাধাস্বামী, সাচ্চা সওদা, নিরঙ্কারী, নামধারী, রবিদাস প্রভৃতি প্রায় ৯ হাজার 'ডেরা' এখানে কাজ করে চলেছে, যারা শিখ সমাজের তথাকথিত নীম্নবর্ণকে ঠাঁই দিয়েছে। ১৯২৫ সালে ব্রিটিশের তৈরি 'গুরুদ্বারা অ্যাক্ট' ২০০৮ সালে এসে 'শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি হয়ে গেল, তারাই শিখপন্থের হর্তাকর্তা বনে গেল। ২০০৯ সালে হরিয়ানা হাইকোর্ট ৮০০ বছরের ধর্মীয় প্রথা ভেঙে ঘোষণা করে দিল দীর্ঘ কেশধারী ছাড়া বাকিরা শিখ নয়। পাওয়ার পলিটিক্সের চক্রব্যূহে নানকজীর স্বপ্নও বুঝি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে।

যে শিখপন্থ তৈরি হয়েছিল হিন্দুধর্মের বর্ণভেদ, জাতিভেদ, আচার সর্বস্বতাকে দূর করে ধর্মকে পরিশুদ্ধ করার জন্য— সে আজ দুষ্ট রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে নিজেই কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। দশ গুরুর সারা জীবনের সাধনা, পাঁচ গুরুর আত্মাহুতি, স্বধর্মরক্ষায় হাজার হাজার শিখের বলিদান— সবকিছু ভুলে কিছু পথভ্রষ্ট শিখ শত্রুদেশের অঙ্গুলিহেলনে দেশ ভাঙতে তৎপর হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন হতে হবে। কারণ 'শিখ' কোনো আলাদা ধর্মমত নয়। ভারতের সনাতন পরম্পরারই একটি মতবাদ। একে অপরের পরিপূরক। ▮

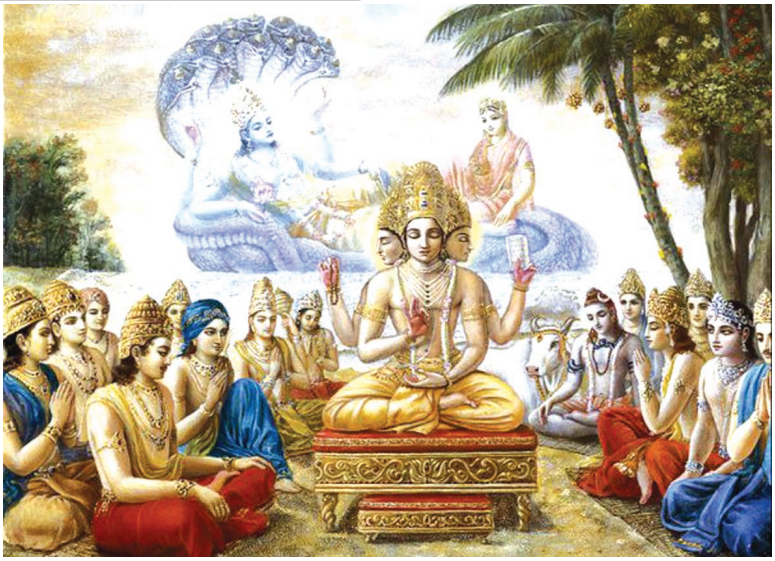

ধর্মজিজ্ঞাসা—চোদ্দ

ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও দেবতা
একই অঙ্গে বহুরূপ একেই বহু, বহুতে এক

নন্দলাল ভট্টাচার্য

এক তিনি বহু হলেন। এ হলো সনাতন ধর্মের এক সর্বজনীন সত্য। এ ধারণার উৎস বেদ ও পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থগুলিতে। এই তত্ত্ব বা ধারণার আলোতেই সাধারণ মানুষের কাছে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও দেবতা মিলেমিশে একাকার। একেরই এই বহু নাম এমনটাও ভেবে থাকেন অনেকেই। এই ভাবনার মূলে রয়েছে সত্য, আছে ভ্রান্তিও। চরম সত্যে যাঁরা পৌঁছেছেন, যাঁদের হয়েছে আত্মদর্শন, যাঁদের অনুভবে সবই ব্রহ্মময়, তাঁদের চেতনায় এই শব্দ বা অভিধাগুলি একাকার হয়ে যেতেই পারে। কিন্তু সাধারণ অর্থে এরা অর্থাৎ শব্দগুলি এক হয়েও এক নয়। সব অর্থেই এগুলি হল বহুত্ববাচক। সেই বহুত্বের উৎসেই যাওয়া দরকার—একত্বে পৌঁছবার জন্য। তবে এক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বচন সর্বভূতে আত্মা বা এক আত্মায় সর্বভূত—এই জ্ঞানটাই যথেষ্ট নয়। জ্ঞানের সঙ্গে চাই সাধনা এবং সাধনালব্ধ অনুভূতি। তাতেই খুলে যায় প্রকৃত জ্ঞানের দরজা-জানালা, তখনই বোঝা যায় বিষয়গুলি সম্যকভাবে।

সর্বভূতে ব্রহ্ম

ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। ব্রহ্ম অক্ষয়। আর সবেরই আছে ক্ষয়। আছে বৃদ্ধি ও বিনাশ। সব কিছুর মধ্যেই ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্ম থেকেই সব কিছুর উদ্ভব। পরিণতিতে বিলয়ও সেই ব্রহ্মে। স্বভাবতই এই ব্রহ্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। ব্রহ্মদর্শীরা নানাভাবে জানিয়েছেন তাঁদের উপলব্ধির কথা। বলেছেন কীভাবে আস্বাদন করা যায় ব্রহ্মরসের আনন্দ।

যেমন অঙ্গিরা ঋষি সরলভাবেই প্রকাশ করেন তাঁর উপলব্ধির কথা মহাধার্মিক গৃহস্থ শৌনককে। তিনি যে শৌনককে ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে উপদেশ দেন তার থেকে বোঝা যায়, কেবল কর্মত্যাগী ব্রহ্মচারী বা সাধু সন্ন্যাসীরা নন, ধর্মনিষ্ঠ সুগৃহস্থও জিজ্ঞাসু হয়ে এলে ঋষিরা তাঁদেরও উপদেশ দিতেন সমান নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে।

সেকালের নিয়ম ছিল গুরুর কাছে খালি হাতে যেতে নেই। সেই দক্ষিণা বা প্রণামী যে দামি কিছু হতে হবে তা নয়। সাধারণত শিক্ষার্থীরা গুরুর কাছে যেতেন সমিধ অর্থাৎ যজ্ঞকাঠ নিয়ে। গুরুরা ছিলেন সাগ্নিক। তাই যজ্ঞকাঠ পেলে তাঁরা খুশি হতেন। ওতেই তুষ্ট হতেন তাঁরা। সেই ধারা অনুসরণ করেই গৃহস্থ শৌনক সমিধ হাতে গেলেন অঙ্গিরার কাছে।

শৌনকের শূন্য জিজ্ঞাসু মনকে জ্ঞানের বারিতে পূর্ণ করতে অঙ্গিরা তাঁকে বলেন, একের জ্ঞান হয় যে পরাবিদ্যায় অথবা যে অপরা বিদ্যায় বহুর জ্ঞান হয় সেই দুই বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা উচিত। তিনি বলেন, অপরাবিদ্যায় বিদ্বান হতে হবে অবশ্যই। তবে যে বিদ্যা ব্রহ্মের কাছে পৌঁছে দেবে না। তার জন্য প্রয়োজন পরাবিদ্যার। একমাত্র পরাবিদ্যায় পারদর্শী হলেই বিবেক হয় নির্মল। তখনই ঘটে অক্ষয় ব্রহ্মের দর্শন। ব্রহ্মই সবকিছু উৎস। উদাহরণ দিয়ে ঋষি বলেন, মাকড়সা নিজের দেহরস দিয়েই তৈরি করে সুতো বা তন্তু এবং পরে আবার তা নিজের দেহের মধ্যেই তা গুটিয়ে নেয়। মাকড়সার মতোই ব্রহ্মও একইভাবে নিজের সত্তা থেকেই এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ অনভিব্যক্ত বা প্রকাশিত বিশ্বকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশ করেছেন। ব্রহ্মনিরপেক্ষ জগতের কোনো সত্তা নেই। ব্রহ্মই সব। ব্রহ্মরই নানা রূপের প্রকাশ ঈশ্বর, ভগবান, দেবতা ইত্যাদি নামের মধ্য দিয়ে।

পুরাণ মতে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা। প্রজাপতি কিন্তু তিনিও ব্রহ্মেরই একটি প্রকাশ। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আর সবকিছুর মতো ব্রহ্মারও স্রষ্টা তিনি। কূর্মপুরাণকথায় এই ব্রহ্মাকেই অভিহিত করা হয়েছে নারায়ণ বা শ্রীহরি হিসেবে। তাঁরই ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড। সেই এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মারই সৃষ্টি কয়েক প্রকার। আবার তাঁরই ইচ্ছায় প্রলয় বা ধ্বংস। আবার সব ব্রহ্মাণ্ডের সব ব্রহ্মাই যে একরকম তাও নয়। কোনো সময় তিনি চতুর্মুখ, কখনও দশানন আবার শত বদনও কোনো কোনো সময়।

ব্রহ্মের ইচ্ছায় সৃষ্ট বর্তমান ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা হলেন চতুর্মুখ। ক্ষমতা ভোগ করতে করতে অনেক সময় এই ব্রহ্মারাও হন অহংকারী। অনেকেই ভাবেন সবকিছুর কর্তা। তিনি যে ব্রহ্মের হাতের সুতোর টানে পুতুলনাচের পুতুলের মতোই সব কিছু করলেন একথাটাও ভুলে যান। আর তখনই ঘটে বিপর্যয়। হলোও তাই।

সেবার সৃষ্টির শুরুতে ব্রহ্মা দেখেন

জলময় মহাসমুদ্রে শয়ান বিরাট এক পুরুষ। তাঁকে দেখে বিস্মিত ব্রহ্মা। বলেন, কে আপনি?

সেই পুরুষ বলেন, আমি নারায়ণ। এই বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংস আমিই করি। বিশ্ব চরাচরের স্থিতি এই আমার দেহে। তা আপনি কে?

---আমি বিধাতা। চতুর্মুখ ব্রহ্মা। সৃষ্টি থেকে যা কিছু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই রয়েছে আমার এই উদরে।

—তাই নাকি? আমার যে বড়ো ইচ্ছে হচ্ছে সব কিছু দেখার। অনুমতি মিললে একবার আপনার পেটের মধ্যে ঢুকে সবকিছু দেখে আসি।

—বেশ তো, দেখুন। কোনো আপত্তি নেই আমার। নারায়ণ একটু হেসে অণুর বেশে সূক্ষ্ম রূপে প্রবেশ করলেন ব্রহ্মার দেহে। দেখলেন কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই সেখানে রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু। দেখার পর ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, হ্যাঁ, দেখলাম বটে সবই। তা ইচ্ছে করলে আমার দেহে ঢুকে দেখতে পারেন যথার্থই আমি যা বলেছি তা ঠিক কিনা?

ব্রহ্মা একটু তাচ্ছিল্যভাবেই প্রবেশ করেন নারায়ণের দেহে। ঢুকে রীতিমতো দিশেহারা। সত্যিই তো দেহের মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মাণ্ড। তবে একটি নয়, কোটি কোটি। দেখে শেষ করা যায় না সব কিছু।

ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত ব্রহ্মা এবার ওই দেহ থেকে বেরিয়ে আসতে চান। কিন্তু বের হবার পথ পান না। সব দ্বারই যে রুদ্ধ। তাহলে বের হবেন কী করে?

ব্রহ্মা এবার ভীত, বিভ্রান্ত। ঘুরতে ঘুরতে সেই পুরুষের নাভির কাছে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন ব্রহ্মা। দেখেন, ওই একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে। তাই মুহূর্ত দেরি না করে ওই পথেই বেরিয়ে এলেন। বসলেন ওই পুরুষের নাভি থেকে উত্থিত পদ্মের উপর।

একটু জিরিয়ে নিয়ে ব্রহ্মা বলেন, আপনি যে বিরাট পুরুষ তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমাকে হঠাৎ আপনার দেহে আটকে রাখার ইচ্ছে হলো কেন? পারলেন কি আটকে রাখতে?

—এ তোমার ভুল ধারণা। আমার ইচ্ছে না হলে তুমি কি বের হয়ে আসতে পারতে? ব্যাপারটা কী জানো, তোমাকে যে প্রজা সৃষ্টির কাজটা করতে হবে এবং সেটা আমারই ইচ্ছায়। তাই বলছি মিথ্যে গর্ব করো না। তুমি আমারই অংশ মাত্র। আমার থেকেই উদ্ভব তোমার। যা করছো তাও আমারই ইচ্ছায়। যাও এবার নিজের কাজে মন দাও।

ঈশ্বর

অবাঙ্‌মানসগোচর বিমূর্ত ব্রহ্মের মূর্ত রূপ হলো ঈশ্বর। একেশ্বরবাদী চিন্তায় ঈশ্বরকে সর্বোচ্চ সত্তা, স্রষ্টা ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে প্রধান উপাস্য হিসাবে কল্পনা করা হয়। ঈশ্বর কথার আক্ষরিক অর্থ আরাধ্য, ভগবান, স্রষ্টা, প্রভু, স্বামী বা প্রধান আশ্রয়। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, বহুশ্বরবাদী ইত্যাদির মতো ঈশ্বর হলো জাগতিক ক্ষমতার সবচেয়ে উঁচুস্তরে অবস্থিত একটি অস্তিত্ব।

সাধারণভাবে ঈশ্বরকে বলা হয় সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছু জানেন। অর্থাৎ সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সর্বজনের। প্রাচীন শাস্ত্রে ঈশ্বর বলতে বোঝান হয়েছে পরমাত্মাকে। অন্যদিকে ঈশ্বর হলেন পঞ্চানন বা মহাদেবের পঞ্চমুখের অন্যতম ঈশান-শব্দভূত। সনাতন ধর্মে শাস্ত্রভেদে ঈশ্বর শব্দের অন্যান্য অর্থ হলো—ভগবান, পরমেশ্বর, ইষ্টদেবতা অথবা বিশেষ আত্মা। এই শব্দগুলিই কালক্রমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঈশ্বরের রূপ নেয়। তাই ব্রহ্মকে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় বদ্ধ করা যায় না। সে কারণেই তাঁকে ধারণায় আনার জন্য অভিহিত করা হয় এক এক নামে। শাস্ত্রমতে, ঈশ্বরই পরমাত্মা। আত্মা রূপে তিনিই বিদ্যমান সর্বজীবে। জীব—তা সে যে আকারেই হোক, বিরাট থেকে অণু—সবকিছুর সঙ্গেই রয়েছেন তিনি। বিশ্ব চরাচরের স্রষ্টাকে অনুভব করা যায় তাঁরই সৃষ্টির মধ্যে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? অন্তত ঈশ্বরকে যাঁরা অস্বীকার করেন, যাঁরা ঈশ্বর বিদ্বেষী তাঁদের মধ্যে এই প্রশ্নতো আসে অনিবার্যভাবেই।

ভাগবত পুরাণে রয়েছে বিষ্ণু বিদ্বেষী দুই ভাই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। নানাভাবেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার জন্য সচেষ্ট থাকত। তারই মূল্য চোকাতে গিয়ে হিরণ্যাক্ষ নিহত হয় বিষ্ণুর হাতে। আর তাতেই হিরণ্যকশিপুর ঈশ্বর বিদ্বেষ আরও বেড়ে যায়। কিন্তু সর্ষের মধ্যেই থাকে ভূত। এমনটাই বলা হয় সাধারণভাবে। হিরণ্যকশিপুর ক্ষেত্রেও হলো তাই। তাঁরই ছেলে প্রহ্লাদ হলেন ঈশ্বরময়—পুরোপুরি বিষ্ণুভক্ত। কোনোভাবেই ছেলেকে নিজের পথে আনতে পারেন না। প্রহ্লাদকে ওই কারণে তিনি হত্যা পর্যন্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিষ্ণু বা ঈশ্বর রক্ষা করেন তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদকে।

বারবার ব্যর্থ হয়ে হিরণ্যকশিপু তখন ক্রোধে প্রায় অন্ধ। সেই রাগেই পুত্রের কাছে তাঁর চরম প্রশ্ন, কোথায় থাকে তোর ঈশ্বর, ওই হরি।

প্রহ্লাদ জানান, সবই তাঁর সৃষ্টি। আর সেই কারণে তিনি রয়েছেন সর্বত্র—সব কিছুতেই।

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ আর ব্যঙ্গে ভরা প্রশ্ন, রাজসভায় এই যে স্তম্ভ, তার মধ্যেও কি আছে তোর ঈশ্বর?

---বললাম তো বাবা। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। সব কিছুতেই রয়েছে তাঁর অবস্থান।

—তাই! বলেই প্রচণ্ড আঘাত করেন সামনের স্তম্ভে। আর তখনই অলৌকিকভাবে সেই স্তম্ভ থেকে বেরিয়ে এল এক অস্বাভাবিক প্রাণী। না-মানুষ, না-সিংহ—যাকে বলা হয় নরসিংহ। সেই নরসিংহ হিরণ্যকশিপুকে টেনে নেন নিজের কোলে। তারপর দু হাতের তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে বিদীর্ণ করেন হিরণ্যকশিপুর দেহ। একইসঙ্গে মৃত্যু হলো এক ঈশ্বরবিদ্বেষীর এবং সকলের সামনে উদ্ভাসিত হলো সত্যসূর্য, ঈশ্বর আছেন সর্বত্র—সর্বভূতে সমানভাবে।

নামের দিক থেকে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরকে ভিন্ন মনে হলেও সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয় দু'য়ের অভিন্নতাই। আবার অন্য দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় ব্রহ্ম এবং ঈশ্বর এক আবার আলাদা। যেমন জল আর বরফ। দেখতে আলাদা কিন্তু উৎস বা বস্তুগত দিক থেকে এক।

ভগবান

সনাতন ধর্মে এবং অভিধানিক ভাবে, ভগ বলতে বোঝায় ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে। এই ছটি গুণ (ষড়ৈশ্বর্য) যাঁর মধ্যে পুরোপুরি প্রকাশ পায় তাঁকেই বলা হয় ভগবান। ঈশ্বরকে যখন এই ছ'টি গুণের অধীশ্বর হিসেবে কল্পনা করে আরাধনা করা হয়, তখন তিনি ভগবান নামে অভিহিত হন। ন্যায়সূত্র অনুযায়ী 'ঈশ্বরঃ কারণং পুরষকর্মাফল্যদর্শনাৎ' (৪।১।১৯) অর্থাৎ কর্মফল মুক্ত পুরুষ হলেন ঈশ্বর। পুরুষ হলো চৈতন্যময় সত্তা। তারই নাম ব্রহ্ম।

স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে প্রশ্ন ঃ কে এই পুরুষ? উত্তর, পুরুষ হলো চৈতন্যময় সত্তা। যাকে ব্রহ্ম বলা হয়। ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষক।

শাস্ত্রীয় বচন ঃ ঈশ্বর এক চরাচরের স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক। আর ভগবান হলেন, ষড়ৈশ্বর্য গুণের অধিকারী। ঈশ্বর সর্বব্যাপী। ব্যক্তির মধ্যে তিনি আছেন ব্যক্তিত্ব রূপে। আর এটা জেনেই যোগী সাধকরা তাঁরই সঙ্গে একাত্ম হন। তিনি ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও তাঁরই অংশ বলে বুঝতে পারেন।

ব্যষ্টির সমষ্টি হলেন ঈশ্বর। তবুও তিনি ব্যক্তি বিশেষ। সরলভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, মানবদেহ একটি বস্তু। এটি গঠিত বহুকোষের সমন্বয়ে। প্রত্যেকটি কোষ হলো ব্যষ্টি। এরই সহজ ব্যাখ্যা দেহ নির্ভর করে কোষের উপর আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ভর করে জীব বা ব্যক্তির অস্তিত্বের ওপর। অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর যেন একই মুদ্রার দুটি দিক। একটি থাকলে অন্যটিও থাকবেই। দর্শনের দৃষ্টিতে, এই ভূলোকের ওপরে অবস্থিত লোকগুলিতে শুভের পাল্লাই ভারী বলে সমষ্টি বা ঈশ্বরকে সর্ব মঙ্গলস্বরূপ বলা যেতেই পারে। ব্রহ্ম কিন্তু এ সবের অনেক ঊর্ধ্বে। এটি কোনো সাপেক্ষ অবস্থা নয়। অর্থাৎ কোনো কিছুর জন্য বা উপরে ব্রহ্মের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। দার্শনিকদের মতে, ঈশ্বর সুন্দরের স্রষ্টা। ভগবান হলেন শক্তিমান।

ব্যাকরণগত দিক থেকে, ভগবান হচ্ছে 'ভগবত' বিশেষণ পদটির একবচন। এর আক্ষরিক অর্থ 'ভাগ্যবান', 'ধন্য'। আর ভগ হলো বিশেষ্য, ভগ-এর অর্থ ভাগ্য, সম্পদ, ধনশালী ইত্যাদি। সেদিক থেকে 'ভগবান' শব্দটি বহু অর্থজ্ঞাপক। প্রসিদ্ধ, ঐশ্বরিক, পূজনীয়, পবিত্র সব অর্থেৎ ব্যবহার করা হয় ভগবান শব্দটির।

হিন্দুধর্মে ষড়গুণের আধার হিসেবে যাঁর আরাধনা করা হয় তাঁকেই বলা হয় ভগবান। সঙ্কুচিত অর্থে দেবতা বা অবতার বোঝাতে ব্যবহার করা হয় ভগবান শব্দটি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর --এই ত্রিদেব হলেন ভগবান। বৈষ্ণবমতে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে কৃষ্ণকে ভগবান বলা হয়। শৈবমতে শিব হলেন ভগবান। একইভাবে জৈনমতে মহাবীর অথবা বৌদ্ধমতে বুদ্ধ বিশেষণ হিসেবেও ব্যবহার করা হয় ভগবান শব্দটি। ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার বহু অংশেই ভগবান হলেন ঈশ্বরের বিমূর্ত ধারণার প্রতিরূপ।

বিষ্ণুপুরাণে আছে, যিনি সৃষ্টি ও বিলুপ্তি, সত্তার আবির্ভাব ও অন্তর্ধান, জ্ঞান ও অজ্ঞতা বোঝেন তাঁকেই ভগবান বলা উচিত। (৬।৫।৭৮)। পুরাণমতে ভগবান হলেন ঈশ্বরের সম্পূর্ণ প্রকাশ। ব্রহ্মনৈর্ব্যক্তিক। একারণে তিনি প্রকাশিত হন না বা প্রকাশ করা হয় না। জীব এবং প্রকৃতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরমাত্মা হলেন ভগবান।

দেবতা

ভগবান সম্পর্কে আলোচনার সূত্রেই এসে পড়ে দেবতাদের কথা। হিন্দুধর্মে দেবদেবীর সংখ্যা মোটেই নগণ্য নয়। দেবদেবীরা হচ্ছেন ঈশ্বরেরই বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। অনন্তশক্তির অধিকারী। ঈশ্বর অশেষ। সেই ঈশ্বর যখন তাঁর কোনো রূপ বা ক্ষমতাকে আকার দেন তখন সেই আকারকে বলে দেবতা। যে রূপ তিনি সৃষ্টি করেন তাঁকে বলা হয় 'ব্রহ্মা। একইভাবে তিনি যে রূপে পালন বা নিশানা করেন তাঁদের বলা হয় যথাক্রমে বিষ্ণু ও মহেশ্বর। এই ভাবেই আবির্ভূত হন দুর্গা, কালী, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি দেবী। মনে রাখা দরকার, এঁরা কেউই কিন্তু ঈশ্বর নন। এঁরা সকলেই ঈশ্বরের নানা গুণের আধার বা প্রকাশ মাত্র। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, অবিনশ্বর। কিন্তু দেবতারা সেই অর্থে অমর নন। কল্পনাতে সব কিছুর সঙ্গে তাঁদেরও বিলোপ হয়। নতুনকল্পে নতুনভাবে আবার হয় তাঁদের উদ্ভব। বেদে দেবতাদের দেব ও দেবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শব্দগুলি উৎপত্তি 'দিব্' ধাতু থেকে। ধাতুটির নানা অর্থের একটি হলো প্রকাশ পাওয়া। যিনি প্রকাশিত হন, যিনি ভাস্বর, স্বপ্রকাশ—তিনিই দেবতা। বেদে বহু দেবতার নাম পাওয়া গেলেও প্রধান আছেন তিনজন— ইন্দ্র, অগ্নি ও সোম।

দেবতার কল্পনা চাররকম। যেমন, যাজ্ঞিকদের কাছে দেবতা হলেন মন্ত্রস্বরূপ। যজ্ঞে যাঁকে হবি দেওয়ার হয় তিনিই দেবতা। একত্ববাদীদের কাছে দেবতা হলেন পরব্রহ্মের প্রতীক। তিনি ব্রহ্ম সাধকদের সামনে আবির্ভূত হন এক এক রূপে। এক একটি রূপ এক একটি দেবতা। অচেতন বা জড় বস্তুর অধিষ্ঠাতা হিসেবে দেবতাদের কল্পনা করা হয়েছে। যেমন পৃথিবীর অধিপতি অগ্নি, অন্তরিক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং দ্যুলোকে সূর্য। এইভাবে প্রতিস্থানে রয়েছেন ১১জন করে দেবতা। তাঁদের মিলিত সংখ্যা হলো ৩৩। অন্য মতে দেবতারা উন্নত ধরনের দেহধারী। তবে তাঁদেরও জন্ম-মৃত্যু আছে। তাঁরা দীর্ঘায়ু বলেই তাঁদের অমর মনে হয়।

ভারতে আছে নানা দেবদেবীর মূর্তি। প্রতিমা গড়েও হয় পুজো। কিন্তু প্রায় সবক্ষেত্রেই পুজোটা হয় ঘটে। ঘটের মধ্যেই দেবতার অবস্থান। আসলে সব দেবতাই ঈশ্বর বা মহান পুরুষ প্রকৃতির শক্তি বা অংশমাত্র। সকলেই নানা আকারের পাত্রে রাখা জলের মতো রূপ নেই আধারের আকারে।

দার্শনিকরা বলে থাকেন, নিরাকার ব্রহ্মকে সকলে সব সময় ধারণায় আনতে পারেন না। তাই সাকার ব্রহ্মের আরাধনা। অন্তিমে ভারতীয় সব সাধনারই শেষ নিরাকারে—

অক্ষয়-অদ্বয় পরব্রহ্মের সঙ্গে মিলনে।

সহজ কথায়, সাগরের জল ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়, উত্তাপে হয় বাষ্প। সেই বাষ্পই পরিণত হয় মেঘে এবং মেঘ থেকে হয় বৃষ্টি। যা মেশে সাগরেই। ঈশ্বর, ভগবান, দেবতাও সেই রকমই। ব্রহ্মে উৎপত্তি—শেষও ব্রহ্মেই।

ফসলের উৎসব করম পুজো

রবিব্রত ঘোষ

করম পরব ভারতের ঝাড়খণ্ড, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত জনজাতিদের উৎসব। মূলত এটা ফসলের উৎসব। করম উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা পাঁচদিনের কোথাও-বা সাতদিনেরও হয়। এ উৎসবে করম দেবতার উপাসনা করা হয়। যিনি একাধারে শক্তি এবং আরেকদিক দিয়ে যৌবনের দেবতা। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে করম উৎসব পালন করা হয়। অবশ্য এর সাতদিন আগে থেকেই এই উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। সাতদিন আগেই গ্রামের মেয়েরা ভোরবেলা শালের কাঠি ভেঙে নদী বা পুকুরে স্নান করে তারপর বাঁশ দিয়ে তাদের ডোনা টুপি ভর্তি করে। এরপর গ্রামের কোনো এক প্রান্তে ডোনাগুলিকে রেখে আসতে হয়। এই সময় মেয়েরা গান গাইতে গাইতে তিন পাক ঘোরে তাতে তেল হলুদ দিয়ে মটর, মুগ, ছোলা প্রভৃতির বীজ মাখানো হয়।

অবিবাহিত মেয়েরা স্নান করে ভিজে কাপড়ে ছোট শালপাতার থালায় বীজগুলোকে পোঁতে ও তাতে কাজলের তিনটে দাগ টানা হয়। যাকে জাওয়া পাতা বলা হয়। প্রত্যেকের জাওয়া আলাদা আলাদা করে চেনার জন্য কাঠ পুঁতে দেওয়া হয়। একে জাওয়া পোঁতা বলা হয়। যে ডালায় একাধিক বীজ পোতা হয় তাকে সাঙ্গী জাওয়া বলে। আজ যে ডালায় একটি বীজ পোঁতা হয় তাকে একাঙ্গী জাওয়া ডালা বলা হয়।

যে সমস্ত কুমারী এই কাজ করেন তাদের জাওয়া মা বলা হয়। এরপর মেয়েরা গ্রামে ফিরে আসেন। উৎসবের দিন স্নান করে পাঁচটি ঝিঙে পাতাকে উলটো করে বিছিয়ে দেওয়া হয়। আল্পনা দেওয়া হয় এবং দেওয়ালে সিঁদুরের দাগ দিয়ে কাজলের ফোঁটা দেওয়া হয়।

এইদিন গ্রামের পুরুষেরা শালগাছের ডাল কেটে আনে। গ্রামের একটি স্থানে দুটি করম ডাল পুঁতে দেওয়া হয়, যা সন্ধ্যার পর করম ঠাকুর বা ধরমঠাকুর বলে পূজিত হন।

করমপূজায় পুরোহিত প্রথমে একটা ফুল দিয়ে গ্রামের দেবদেবীকে আরাধনা করে। তারপর কিছু ফুল ও তুলসীতে সিঁদুর মাখিয়ে করম ডালের নীচের অংশে থাকা করমের আরাধনা করে। গোল করে বসে থাকা ভক্তরা হাতে একটি করে ফুল দিয়ে করম দেবতাকে প্রণাম করে ও অঞ্জলি দেয়। কোনো কোনো জায়গায় এরপর ব্রতকথা পাঠ করা হয় লক্ষ্মী বা সন্তোষীমাতার। বহুল প্রচলিত একটি ব্রতকথা হলো—এক গ্রামে ছিল সাত ভাই। আর তাদের সাত বউ। চাষবাস করে তাদের দিন কাটত। সাতভাই ক্ষেতে কাজ করতে এলে তাদের বউরা দুপুরের খাবার দিয়ে আসত। সাতভাইয়ের খাওয়া হয়ে গেলে তারা আবার ফিরে যেতে নিজেদের বাড়িতে। এমনই একদিন দুপুরবেলায় তারা বাড়িতে এসে দ্যাখে, সাত বউ বাড়ির উঠোনে এক করম গাছের নীচে নাচ-গানে ব্যস্ত হয়ে আছে। তাদের

আনন্দ দেখে সাতভাই রাগে দুঃখে ভেঙে ফেলল সেই গাছ। তারপর থেকেই তাদের আর মনে আনন্দ নেই, ঘরে ভাত কাপড়ের অভাব দেখা দিল। শেষে তাদের পারিবারিক অবস্থার অবনতি হলো। তারা গরিব হয়ে গেল। অনেক দুঃখে এর প্রতিকার খুঁজতে লাগল সাতভাই। এক পুরোহিত উপায় বললেন, করম পূজার। করম দেবতা শক্তি, যৌবন ও সমৃদ্ধির প্রতীক। তাঁর পূজা করলে সাতভাই আবার তাদের কর্মক্ষমতা ফিরে পাবে, আবার চাষের জমিতে ফসল ফলবে, আবার সংসারে আগের অবস্থা ফিরে আসবে। সাত ভাই আর সাত বউ মিলে পুজো দিল। ধীরে ধীরে আবার আগের অবস্থা তারা ফিরে পেল।

আর একটি উপাখ্যান হলো করম ঠাকুর সিংহ (রাজা) ছিলেন মেবারের কাছে এক প্রদেশের রাজা। পার্শ্ববর্তী রাজ্য ছিল শিরোহি। শিরোহির রাজা মেবারের রাজা করম ঠাকুরকে বাংলাদেশ জয়ে সাহায্যের জন্য যুদ্ধে আমন্ত্রণ করেন। রাজা করম ঠাকুর সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সৈন্যসামন্ত সহকারে যোগ দেন যুদ্ধে। কিন্তু জঙ্গলমহলের এই ঘন জঙ্গলে তাঁরা পথ হারান। কিছুতেই সেই বনজঙ্গলের দেশ থেকে আর ফিরে যেতে পারেন না। অনাহারে, অভাবে কোনোভাবে দিন কাটতে থাকে। বহুদিন পর বেঁচে থাকার জন্য তাঁরা চাষবাসের কাজ শুরু করেন। এর পর সেইসব রাজা, সৈন্যসামন্তদের বংশধরেরা চাষি রূপেই জঙ্গলমহলে অবস্থান করতে থাকেন।

পুজোয় অন্যতম প্রার্থনীয় থাকে যাতে মেয়েরা স্বামীসোহাগিনী ও সন্তানবতী হয়। জাওয়া পাতানো কুমারী মেয়েরা জাওয়ার শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য বেশকিছু কঠিন নিয়ম পালন করে। এই কদিন তারা শাক খায় না। খাটিয়াতে বা বিছানায় ঘুমায় না। মাথায় তেল দেয় না, চিরুনি ব্যবহার করে না। এছাড়া প্রতি সন্ধ্যায় নিজের নিজের জাওয়া সহ তারা এক জায়গায় জড়ো হয়। জাওয়াকে কেন্দ্র করে চলে করম নাচ ও গান।

পুজোর দিন কুমারী মেয়েরা সারা দিন উপোস করে। সন্ধ্যার পর থালায় ফুল ফল ইত্যাদি দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে ওই স্থানে গিয়ে পুজো করে। তারপর সারারাত ধরে চলে নাচ-গান। পরদিন সকালবেলায় মেয়েরা জাওয়া থেকে অঙ্কুরিত বীজগুলোকে তুলে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে বাড়ির কাছাকাছি কোনো জমিতে ছড়িয়ে দেয়। এরপর করম ডালকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েরা একে অপরকে করম ডোর বা রাখি পরিয়ে দেয়। তারা একে অপরকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য শপথ গ্রহণ করে। কোনও কোনও জায়গায় পুজার শেষে ভাই-বোন দিদি-দাদাকে চন্দন, ফুল, দূর্বা, ধান ইত্যাদি দিয়ে বরণ করে ছড়া কাটা হয়—আয়রে করম রাজা হাতি চাপি আয় / আয়রে করম রানী ঘোড়া চাপি আয় / অর্থাৎ সৌভাগ্যবান হও, সৌভাগ্যবতী হও।

করম উৎসবের দিন সারারাত ধরে সূর্যোদয় পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে ভাদুরিয়া, ঝুমুর, যৌথ নাচ হয়। অবিবাহিত বা প্রথম বছরের নববিবাহিত মেয়েরাই অংশগ্রহণ করতে পারে। নাচুনিরা অর্ধবৃত্তাকারে হাত ধরাধরি করে এক পা এগিয়ে পিছিয়ে জাওয়াগুলোকে কেন্দ্র করে ঘুরে ঘুরে নাচ করে। একজন উচ্চৈঃস্বরে গান শুরু করে এবং বাকিরা গান করে একই কথা বারবার বলতে থাকে।

আইসতন লো সঙ্গতি সবাই হাত ধইরে নাচ লো / একমনে জাওয়া দিব জাওয়া যেমন বাড়ছে লো / কাঁসাই নদীর বালি আইলে জাওয়া পাতার লো / হামদের জিওয়া উঠে শাল ধুধের পারালো।

এই পরবের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো জাওয়া গান। এই গানগুলির কোনও লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। মুখেং মুখে গানগুলি প্রচলিত। গানগুলির মধ্যে নারীর সূক্ষ্ম চাওয়া পাওয়া, অকথিত বাসনা, অব্যক্ত বেদনাগুলি খুব সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।

গানগুলি মূলত ছটি পর্যায়ের হয়—১। আচার মূলক, ২। ডাইরা মানে রাস্তা। করমের ব্রতীরা পার্বতী নামে পরিচিত। তারা বাড়ি থেকে পুজোর স্থান অবধি জাওরা ডালা নিয়ে যাবার সময় এই ধরনের গান গাইতে গাইতে যায়। ৩। আখড়া বন্দনা, ৪। চাষবাস সম্পর্কিত, ৫। নারী ও সমাজকেন্দ্রিক, ৬। ভাসান। ভাসান গানগুলির উদাহরণ— যাও যাও করম ঠাকুর যাও ছয় মাস / পরের ভাদর মাস আনবো ঘুরাই।

সমাজতাত্ত্বিকদের মতে করম উৎসব প্রধানত সৃষ্টির উৎসব। সৃজনশীলতার ইঙ্গিত। এই উৎসবের মূল আচার যে জাওয়া পোঁতা তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সৃজনশীলতার ইঙ্গিত।
জন্ম-জাত-জাওয়া। কুড়মালি ভাষায় এর অর্থ অঙ্কুরোদ্গম। একদিকে যেমন ফসল উৎপাদনের দ্যোতক আবার মানব সন্তান জন্মানোরও অর্থবাহী।

করম গাছকে কর্মের প্রতীক ধরা হয়। করম পরব মহিলাদের দ্বারা শস্যবীজ রোপণ করা, তাকে যত্ন করার মধ্য দিয়ে আমাদের মনে করিয়ে দেয় পরিবারে ও সমাজে নারীর স্থান। প্রকৃতির গুরুত্ব প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সহাবস্থানই আমাদের জীবিত রাখে। শিশুও নতুন প্রজন্মের কাছে প্রকৃতিপ্রেম কর্ম ও ধর্মের গুরুত্বকে রূপায়িত করতে শেখায়।

করম গাছের সঙ্গে কদম গাছের একটি যোগ আছে। এই গাছের ফুল কৃষ্ণের খুব প্রিয়। আর কৃষ্ণ এই গাছের তলায় বাঁশি বাজাতেন। আবার দুটি করম গাছের ডাল রাধা-কৃষ্ণের প্রতীকও হতে পারে। □

বঙ্গভূমি অপেক্ষা করছে আর এক গোপালের আবির্ভাবের

গোপাল চক্রবর্তী

সম্রাট ধর্মপালের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ খালিমপুর তাম্রশাসনে তাঁর পিতা মহারাজ গোপালদেবের সিংহাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন যে গোপালের সিংহাসন লাভের আগে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অরাজকতার চল ছিল। এইরূপ অরাজকতাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'দণ্ডধরের অভাবে যখন বলবান দুর্বলকে গ্রাস করে অর্থাৎ মাছের রাজত্বের মতো, যেখানে বড়ো মাছ ছোটো মাছকে ভক্ষণ করে।' কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় এই 'মাৎস্যন্যায়' নামক অরাজকতা প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক সময়েই উদ্ভব ঘটত এবং তার অবসান কল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হতো। পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোপালের সিংহাসন লাভের আগেও এইরূপ মাৎস্যন্যায় অরাজকতার উদ্ভব ঘটেছিল।

মহারাজ শশাঙ্কের রাজত্বের অবসানের পর বঙ্গদেশ চারদিক থেকে বারবার আক্রান্ত হতে থাকে। বঙ্গপ্রদেশের অভ্যন্তরে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি, তাম্রলিপি এবং সাহিত্যগ্রন্থে উচ্চাভিলাষী রাজন্যবর্গ কর্তৃক বঙ্গদেশ আক্রমণের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। এই সকল সূত্র ছাড়াও এই সময়ে বঙ্গদেশে যে বারবার বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটেছিল তার অনেক প্রমাণ বিদ্যমান।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ক্রমান্বয়ে আক্রমণের ফলে বঙ্গের বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তা নয়, দেশের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ ও অধিবাসীদের রক্ষা করার জন্য একচ্ছত্র শাসনের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবের ফলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সামন্তরা ক্ষুদ্র সামন্তের উপর নিপীড়ন করত। সামন্ত ও ভূস্বামীরা অসহায় সাধারণ শ্রেণীর লোকদের উপর জোরজবরদস্তি ও যথেচ্ছ অত্যাচার চালাত। এর ফলে জনজীবনে কোনো প্রকার নিরাপত্তা ছিল না। নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে স্বেচ্ছাচারী সামন্তবর্গকে দমন করে গোপালদেব রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করেছিলেন।

গোপালদেবের সিংহাসন লাভ সম্পর্কে তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ একটি কাহিনির অবতারণা করেছিলেন— 'বঙ্গদেশে তখন চরম অরাজকতা, রহস্যময় রাজপ্রাসাদ, যেদিন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেন সেই রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। অবশেষে কেউই আর রাজা হতে চায় না। ফলে অরাজকতা আরও বেড়ে যায়। সমাজের সাধারণ অসহায় মানুষদের উপর শক্তিধর প্রভাবশালীদের বঞ্চনা ও অত্যাচার চরমে উঠে। চারদিকে তখন শুধু নিরাশা আর হাহাকার। এই সময়ে চণ্ডীদেবীর বরপ্রদত্ত লাঠি হাতে এক যুবক এলেন রাজপ্রসাদে। সেই যুবক নির্ভীক ভাবে সিংহাসনে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অন্যান্য রাজপুরুষেরা তখন তাঁর অভিষেকের আয়োজন করলেন। সিংহাসনে আরোহণ করলেন যুবক। রাত্রে যথারীতি রাজকীয় শয্যায় শয়ন করলেন। কিন্তু জাগ্রত থাকলেন লাঠি হাতে। মধ্যরাত্রে এক বিষধর সর্প পালঙ্কের খুঁটি বেয়ে উঠে এল শয্যায়। দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র যুবক সেই চণ্ডীদেবীর বরপ্রদত্ত লাঠি দিয়ে সেই বিষধরের ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। প্রাতে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন যুবক। রাজপুরুষেরা শববাহকদের নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন কক্ষের বাইরে। যুবককে জীবিত বেরিয়ে আসতে দেখে তাঁরা বিস্মিত হলেন। সেই যুবক বঙ্গের রাজা হয়ে অরাজকতার অবসান করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। এই যুবক হলেন বাঙ্গলার পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল।'

লামা তারানাথ সম্ভবত এই রূপকটির মাধ্যমে সমসাময়িক বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কত ভয়াবহ ছিল তখনকার পরিস্থিতি। এই রূপক থেকে তা অনুধাবন করা যায়। এছাড়া লামা তারানাথ লিখেছেন— 'There was not a King in the Whole Country. Every influential ksatriya, Brahmin and respectable merchant ruled their own locality independently. Their autocratic rule brought the people great suffering.'

তারানাথের বর্ণনানুসারে এই অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে গোপাল আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে রাজপদে অভিষিক্ত হন। কথিত, মাৎস্যন্যায়ের যুগে গোপালের পিতা শ্রীবপ্যট যথেষ্ট সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। ধারণা করা যায় যে, গোপাল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। সম্ভবত, তাঁর সেনা বাহিনী উত্তরবঙ্গে সর্ববৃহৎ ছিল। গোপালের রাজকীয় গুণাবলি এবং তাঁর সামরিক শক্তি প্রত্যক্ষ করে প্রতিবেশী ভূস্বামীরা অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁকেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সার্বভৌম নরপতির পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। এমনও হতে পারে যে, কোনো এক বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য গোপালের নেতৃত্বে ভূস্বামীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন। গোপালের রাজপদলাভের অব্যবহিত আগে যে বঙ্গ মাৎস্যন্যায় অবস্থা বিরাজ করছিল তা ঐতিহাসিক সত্য।

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূস্বামী ও অভিজাতবর্গ কথিত মাৎস্যন্যায় অবসানকল্পে প্রথমে গোপালের নেতৃত্বে সমবেত হন এবং পরে তাঁকেই সার্বভৌম নৃপতির পদে নির্বাচিত করেন। খালিমপুর তাম্রশাসনে বলা হয়েছে, 'মাৎস্যন্যায় মপোহিতুং প্রকৃতির্ভিলক্ষ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ শিরসাং চূড়ামণি...।' তৃতীয় বিগ্রহ পালের আমগাছি তাম্রশাসনেও বলা হয়েছে যে, 'গোপাল (প্রজাদের) অনুরক্তি লাভ করেছিলেন। তিনি অরাজকতা দূর করে রাজ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গোপাল সার্বভৌম রাজপদ গ্রহণ করে কঠোর হস্তে দেশে বিরাজমান অরাজকতা দূর করে শাসনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে মাৎস্যন্যায়ের অবসান হয়।

ইতিহাসখ্যাত মাৎস্যন্যায়ের অবসান হয়েছে অনেক আগে। কিন্তু পসিচমবঙ্গে রাজনৈতিক মাৎস্যন্যায় বারবার এসেছে। অন্যায় অপশাসনে বারবার জর্জরিত হয়েছে এই রাজ্য। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে। আজও রাজ্য জুড়ে চলছে এক নব্য মাৎস্যন্যায়। চূড়ান্ত অরাজকতা, সাধারণ মানুষ হারিয়েছে বাক্‌স্বাধীনতা। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ অপেক্ষা করছে এই অরাজকতার অবসানের, অপেক্ষা করছে আর এক গোপালের আবির্ভাবের।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

প্রদীপ মারিক

দেশের যুব সমাজের জন্য গঠিত হলো 'মেরা যুবা ভারত'। যুব সম্প্রদায় যে কোনও দেশের এক বড়ো সম্পদ। ভারত একমাত্র দেশ যেখানে বিশ্বের সবথেকে কমবয়সি যুবপ্রজন্মের বসবাস। ভারতে প্রায় ৬৫ শতাংশ জনসংখ্যার গড় বয়স ৩৫ বছরের কম। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে ভারতের গড় বয়স মাত্র ২৯ বছর। চীনের গড় বয়স ৩৮ বছর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪২ বছর এবং জাপানে ৪৮ বছর। চরিত্র গঠন, ধর্ম হোক বা সত্য, যুবসমাজকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর উপদেশ ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে যুব সমাজ। স্বামীজীর এই যুব জাগরণকে যুবনীতিতে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বদ্ধপরিকর।

বিভিন্ন সংগঠনের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল জাতীয় যুব নীতি তৈরি করতে হবে। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েই এবার স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা 'মেরা যুবা ভারত' গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে দেশের যুবদের যোগাযোগ স্থাপনের পাশাপাশি তাদের উন্নয়নে কাজ করা। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যুবকদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। নবগঠিত এই সংস্থার কাজ হবে অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার মাধ্যমে যুব নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নত করা। যুবকদের সামাজিক উদ্ভাবক হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের পাশাপাশি তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। যুব নেতৃত্বের উন্নয়নে সরকারের কাছে প্রকল্পের প্রস্তাব দেওয়া। সেইসঙ্গে যুব সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রকল্প নেবে সেদিকে নজরদারির মাধ্যমে সময় সময় কেন্দ্রকে রিপোর্ট দেবে।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় যুব ডেটা বেস তৈরি করবে। সেই ডেটা বেস মারফত যুবকদের পরিস্থিতি সহজেই জানতে পারবে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই মতো প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হবে। এছাড়াও দেশের ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়নে ফ্রান্স-সহ কয়েকটি দেশের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা যাতে যুব ভারতের নীতি সফল হতে পারে।

হস্ত ও মাঝারি শিল্পের উৎসাহের জন্য উৎসবের মরশুমে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যে ভাবে এগিয়ে এসেছে তার ফলস্বরূপ প্রতিবারের থেকেও এ বছর উৎসবের মরশুমে খাদির পণ্য বিক্রির রেকর্ড গড়েছে। প্রাধান্য পেয়েছে 'ভোকাল ফর লোকাল'। অর্থাৎ দেশীয় প্রযুক্তি এবং আঞ্চলিক শিল্পকর্মকে উৎসাহ দিয়ে, দেশ গঠনের কাজে সেগুলিকে ব্যবহার করা। যার উদ্দেশ্যেই 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযানে যুব সম্প্রদায়কে উৎসাহ দেওয়া। এই স্বশাসিত সংস্থার মাধ্যমে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সি তরুণ, যাদের সংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি, তাদের মধ্যে একটা বড়ো অংশই মেরা যুবা ভারত নীতিতে উপকৃত হবে।

প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে ঐতিহাসিক মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করে যে বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্ত নিলেন, তেমনি এই সংস্থার মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছুক তরুণীদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে যোগ দেওয়ার সুযোগ খুলে দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য গ্রামে বা প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী তরুণ-তরুণীদের দিল্লিতে বা রাজধানী শহরে আসতে হবে না। যুব পোর্টালে কেবল মাত্র নাম নথিভুক্ত করলেই হবে। তাদের বাড়ির কাছেই সেই সুযোগ আসবে। প্রধানমন্ত্রী যুব যোজনার মাধ্যমে ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে দেশের যুব সমাজ এগিয়ে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী যুব পরিকল্পনার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে লেখার বিষয় উৎসাহিত করা হয়েছে।

অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার মাধ্যমে যুব প্রজন্মের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো। তরুণদের সামাজিক উদ্ভাবক, বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে তুলে আনা। তরুণদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো। তাদের সামাজিক উদ্ভাবক, বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে তুলে আনা। তাদের চালিত উন্নয়নে নজরজারি এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'সক্রিয় চালিকা শক্তি' হিসেবে ব্যবহার। তাদের আশা-আকঙ্ক্ষা ও চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। বর্তমানে চালু থাকা বিভিন্ন কর্মসূচিকে একত্রে কাজে লাগিয়ে তাদের দক্ষতা বাড়ানো। যুব সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে ওয়ান স্টপ শপ বা একক মঞ্চ হিসেবে কাজ করা। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কাজকর্মে দ্বিমুখী যোগাযোগের ক্ষেত্রের উন্নতি ঘটানো।

বর্তমানে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে যেখানে সামাজিক মাধ্যম, ডিজিটাল সুযোগ সুবিধা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে, সেখানে যুব প্রজন্মকে যুক্ত করা এবং তাদের ক্ষমতায়নের দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকার মেরা যুবা ভারত গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

যুব সমাজের প্রতি স্বামীজীর বার্তা ছিল, ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। তাই তার ধর্ম-দর্শন-অধ্যাত্মচিন্তা এবং সারা জীবন জুড়ে রয়েছে যুবকের কথা। দেশ গঠনের জন্য স্বামীজীর এই স্বপ্ন সফল করার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের মেরা যুব ভারত নীতি গ্রহণ। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি ও আঞ্চলিক শিল্পকর্মকে উৎসাহ দিয়ে দেশ গঠনের কাজে যুব প্রজন্ম 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযান সফল করতে সক্ষম হবে। তারা প্রধানমন্ত্রীর 'মেরা যুবা ভারত' স্বপ্নকেই বাস্তবায়িত করতে চায়। □

দোতারা আর সুরমণ্ডলের যুগলবন্দি—‘তারা-মণ্ডল’

তিলক সেনগুপ্ত

ফোক ও ক্লাসিক্যালের মেলবন্ধন ঘটনাতে নতুন তারযন্ত্রের আবিষ্কার! সত্যিই তাই। লোকসংগীত পরিবেশনের জন্য দোতারা এবং শাস্ত্রীয় সংগীত উপস্থাপনের জন্য সুরমণ্ডলের যুগলবন্দির নয়া সংস্করণ— ‘তারা-মণ্ডল’।

পাতলা কাঠের আবরণের উপর ২০টি তারের বাঁধনেই তারা- মণ্ডলের সুরমূর্ছনা।

বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রাম কালীপুরের বাসিন্দা বাউল এর আগে কাঠের বাটি দিয়ে দোতারা, বিশাল আকারের তানপুরা বানিয়েছেন আপন মুনশিয়ানায়। এবার তার নতুন সৃষ্টি তারামণ্ডল।

বাউল জগতে পরিচিত নাম নিতাই দাস বাউল। পূর্ণ দাসের অন্যতম স্নেহধন্য। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাউল সাধনায় ব্রতী সিউড়ির কালিপুরের এই খ্যাপা বাউল। নিতান্তই সাধারণ পরিবারে জন্ম তাঁর। বাপ-কাকাদের হাত ধরেই বাউল চর্চায় সঁপেছেন নিজেকে। একনিষ্ঠ বাউল সাধক এই নিতাই দাস বাউল জীবন সায়াহ্নে এসে নতুন করে শিখেছেন খেয়াল। শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি অমোঘ টান থেকেই ষাটোর্ধেও তিনি হয়েছেন ‘খেয়ালে’র শিক্ষার্থী। আর তা থেকেই তিনি পেয়েছেন নতুন সৃষ্টির নয়া উদ্যম। যার ফল ‘তারা-মণ্ডল’।

ছোট্ট অথচ শক্ত কাঠের পাতলা ফ্রেমের মধ্যে প্লাইউড বসিয়ে যন্ত্রটির কাঠামো করেছেন। যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য হলো একটি যন্ত্রের মধ্যে দোতারা এবং সুরমণ্ডলের সংমিশ্রণে ঘটিয়েছেন এই শিল্পী। নিতাই দাস নিজে বাউল শিল্পী একই সঙ্গে হিন্দুস্থানি ক্লাসিক্যালের শিল্পী। ফলে ক্লাসিক্যাল গানে তারযন্ত্র হিসেবে সুরমণ্ডল যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনই বাউল শিল্পী হিসেবে দোতারা হাতে বাউল রাজ্যে তার অবাধ বিচরণ। ইতোমধ্যেই জাপান-সহ একাধিক দেশে তার বাউল গান নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন। এদেশের একাধিক রাজ্যে তার নিয়মিত অনুষ্ঠান লেগে আছে। তার মাঝেই যখন গ্রামের বাড়িতে ফেরেন তখন শিল্পী মন খুঁজতে থাকে নতুন কিছু উদ্ভাবনের। সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই হাতুড়ি বাঁটালি হাতে শুরু করেন কাঠ কাটতে। কাঠের কাঠামো তৈরি করে তার সঙ্গে তারের বাঁধনকে দৃঢ় করতে সুরমণ্ডলের জন্য ১৬টি তার রাখেন। তার মধ্যে সপ্ত সুরের জন্য ১২টি তার বেঁধেছেন। বাকি চারটি তার দোতারার সঙ্গে যুগলবন্দির জন্য সংযোজিত হয়েছে। তার লাগোয়া দোতারার জন্য অতিরিক্ত আরও চারটি তারের সংযোজনে তৈরি হয়েছে তারামণ্ডল যন্ত্র।

ইতোমধ্যেই রাজ্যের একাধিক সম্মানে ভূষিত বাউল শিল্পী নিতাই দাসের কথায়, ‘আমার সাধনার মূল বিষয় খেয়ালের সঙ্গে বাউলের সংমিশ্রণ ঘটনো। সেই ভাবনা থেকেই দোতারার তারা এবং সুরমণ্ডলের মণ্ডলের যুগল মিলনেই আমার তৈরি তারযন্ত্র ‘তারামণ্ডল’। যে যন্ত্রে এক সঙ্গে শাস্ত্রীয় ও লোকসংগীত পরিবেশিত হবে। এই যন্ত্র তৈরি আমার সারা বছরের গবেষণার সুফল। আমি আনন্দে মশগুল’।

দেখতে সুরমণ্ডলের মতো অথচ হালকা সহজে অল্প জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে এই অভিনব যন্ত্র। নিতাই দাসের গানের তালিম শুরু হয় ছোটো থেকেই। বাবা গতিকান্ত দাসের হাত ধরেই গানের শিক্ষা। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তাঁর মঞ্চে গান গাওয়া শুরু। রেডিয়োয় নিয়মিত শিল্পী নিতাই দাস বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তার তৈরি যন্ত্র দেখে সমজদার রসিক শিল্পীরা বরাত দিতে শুরু করেছেন এই যুগলবন্দি তারযন্ত্রের। □

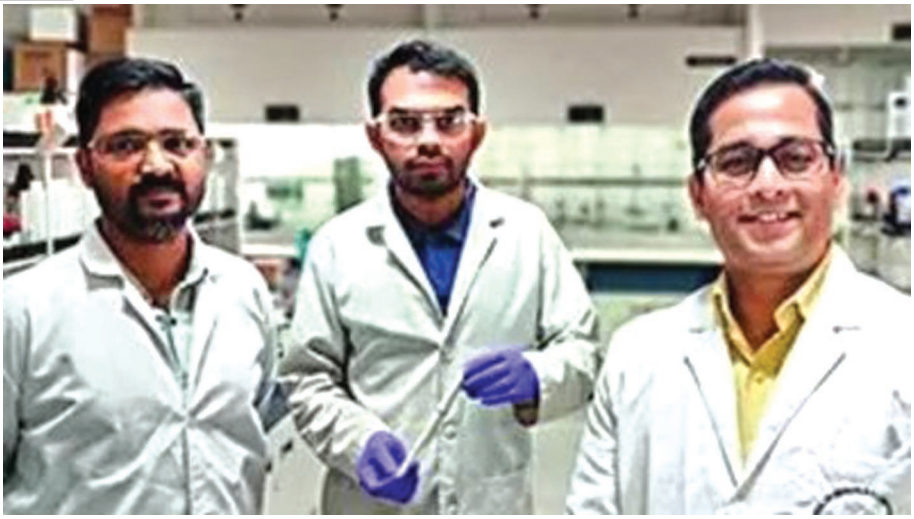

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অসাধারণ আবিষ্কার

আঠা দিয়ে জুড়বে ভাঙা হাড় থেকে ভাঙা চেয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কোনও ব্যান্ডেজ বা প্লাস্টার করার প্রয়োজন পড়বে না। কেবলমাত্র আঠা দিয়েই জুড়ে যাবে ভেঙে যাওয়া হাড়। এমনকী কেটে যাওয়া বা ছিঁড়ে যাওয়া ত্বকও। আবার ওই একই আঠা দিয়ে ভাঙা চেয়ারও জুড়ে ফেলা যাবে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই নতুন আবিষ্কার হইচই ফেলে দিয়েছে।

আঠাটি এমন যা জলের নীচেও ব্যবহার করে হাড় ত্বক বা অন্য কিছু জুড়ে দেওয়া যাবে। এই ম্যাজিক আঠা তৈরি হয়েছে ভোপালের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স, এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ এবং হরিয়ানার স্কুল অব মেডিক্যাল অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেসের গবেষকদের দ্বারা। তবে এই আঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো, আঠাটি বায়োডিগ্রেডিবল্ অর্থাৎ পচনশীল। ব্যবহারের পরে এটি প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায় অর্থাৎ পরিবেশ দূষিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এই আঠার থেকে।

নতুন আবিষ্কৃত এই আঠাটির নাম দেওয়া হয়েছে এ-৩০ (A-30)। শরীরের কোথাও কেটে, ছিঁড়ে গেলে সেলাইয়ের যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না। শরীরের কোনো জায়গায় হাড় ভেঙে গেলে প্লাস্টার করা ছাড়া গতি ছিল না। কিন্তু গবেষকদের দাবি, আঠা ব্যবহার করে বিনা যন্ত্রণায় অল্প সময় সবকিছুই জুড়ে ফেলা যাবে। ভোপালের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স, এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইআইএসইআর)-এর অধ্যাপক আশিস শ্রীবাস্তব ও ড. তন্ময় দত্ত এবং হরিয়ানার স্কুল অব মেডিক্যাল অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেসের ডাঃ আশিস শর্মা এই গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। সম্প্রতি 'কেমিস্ট্রি-এ ইউরোপিয়ান জার্নালে' তাদের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে।

যে কোনো কলা বা টিস্যু জুড়ে দেওয়াই শুধু নয়, সেই ক্ষত শুকিয়ে যাওয়া (healing) এবং সারিয়ে তোলার (repairing) কাজও করবে এই ম্যাজিক গ্লু। এই আঠাটির ব্যাপক হারে উৎপাদন পদ্ধতি বা large scale production method আবিষ্কারের লক্ষ্যে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যেই আঠাটি ভারতীয় পেটেন্ট পেয়েছে। অধ্যাপক আশিস শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, এই ক্লিয়ার সিন্থেটিক বায়োমেডিকেল আঠা শুধু বায়োডিগ্রেডিবল্ই যে তাই নয়, প্রকৃতির সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণও বটে। এটি মানুষের কল্যাণের জন্য।

এটি কোনো ক্ষতিকর বা বিষাক্ত পদার্থ নয়। মানব কলা (tissue), হাড়, ডিমের খোসা, কাঠের মতো অসংখ্য পৃষ্ঠকে এই আঠা জুড়তে পারে। একই সঙ্গে এটি বাতাসে এবং জলের নীচে সমানভাবে কাজ করে। অতিরিক্ত কোনো রাসায়নিক পদার্থ ছাড়াই এটি কিছুক্ষণের মধ্যে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। মেধাবী ও পরিশ্রমী ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই অনন্যসাধারণ আবিষ্কার ভবিষ্যত প্রজন্মকে মানবহিতে বিজ্ঞানচর্চায় নিশ্চিতভাবেই উৎসাহিত করবে।

গুরুর আদেশ পালনের মহিমা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের গুরু ছিলেন সন্দীপনি মুনি। তিনি বালককালে গুরুগৃহে থাকাকালে গুরুর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে, কোনো কিছু চিন্তা না করে তিনি গুরুর আদেশ পালন করতেন। বিদ্যার্থীদের মধ্যে সন্দীপনীর গুরুভক্তি অত্যন্ত

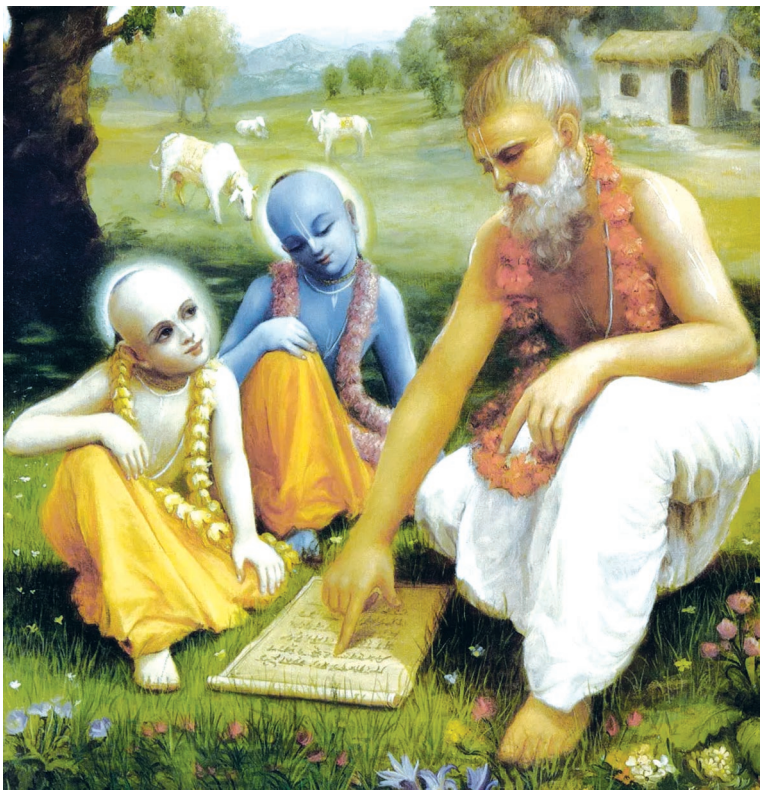

উচ্চমার্গের ছিল। একবার তাঁর গুরু সন্দীপনের গুরুভক্তির পরীক্ষা নেবার কথা ভাবলেন।

একদিন সব শিষ্য আশ্রমের কাজে বাইরে গিয়েছিল। গুরুর শিশুপুত্রটি বাইরে খেলা করছিল। বিদ্যার্থীরা যখনে আশ্রমে ফিরে আসছে, তখন গুরুদেব সন্দীপনিকে বললেন তাঁর পুত্রটিকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিতে। সন্দীপনি বিনাবাক্যব্যয়ে গুরুপুত্রকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলেন। কুয়ো জলভর্তি ছিল। তা দেখে অন্য বিদ্যার্থীরা ছুটে এল। দুজন লাফিয়ে পড়ে কুয়ো থেকে গুরুপুত্রকে তুলে আনল। কেউ গুরুদেবকে একথা জানাতে ছুটে গেল, কেউ কেউ সন্দীপনিকে মারতে শুরু করল। সান্দীপনি চুপচাপ মার সহ্য করতে লাগলেন কিন্তু একবারও বললেন না যে গুরুর আদেশেই তিনি এই কাজ করেছেন। গুরুদেব কিছুক্ষণ পরে বাইরে এসে বললেন, ওকে আর মেরো না, ও তোমাদের গুরুভাই।

আর একদিন শিষ্যরা জঙ্গল থেকে সমিধ সংগ্রহ করে ফিরছিল। তাদের দেখে গুরুদেব সন্দীপনিকে বললেন তাঁর ঘরটিতে আগুন লাগিয়ে দিতে। সন্দীপনী তৎক্ষণাৎ আগুন লাগিয়ে দিলেন। শিষ্যরা তা দেখতে পেয়ে ছুটে এসে প্রথমে আগুন নেভালো, তারপর সন্দীপনিকে মারতে শুরু করল। সন্দীপনি এবারও কিছু না বলে চুপ করে মার খেতে লাগলেন। গুরুদেব এসে আগের মতোই তাদের মারতে নিষেধ করলেন।

সন্দীপনি তেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন না কিন্তু নির্বুদ্ধি নন। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল যে গুরুর আদেশ কোনো প্রশ্ন না করেই পালন করতেন। গুরুর সব থেকে বড়ো সেবা হলো তাঁর আদেশ পালন করা। আর তাতেই গুরুর শক্তি শিষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সেই শক্তি তখনই আসে, যদি গুরুর আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করা হয়। আদেশ পালন করতে বিলম্ব করলে সাধনশক্তিও কমে যায়। সন্দীপনি তাই গুরুর আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই পালন করতেন কোনো বিচার বিবেচনা না করেই।

অধ্যয়ন শেষ হলে শিষ্যরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেল। তাদের মধ্যে কেউ বড়ো পণ্ডিত হলো, কেউ আদর্শ গৃহী হলো, কেউ আদর্শ অধ্যাপক হলো। সন্দীপনিও চলে গেলেন।

কিছুদিন পর গুরুদেব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। খবর পেয়ে শিষ্যরা তাঁকে দেখতে এল। শেষ সময় সমাগত বুঝতে পেরে গুরুদেব তাঁর জিনিসপত্র শিষ্যদের দিতে থাকলেন। কাউকে দিলেন পঞ্চপাত্র, কাউকে আচমনের পাত্র, কাউকে আসন, কাউকে মালা। সকলেই গুরুর আশীর্বাদের জিনিস শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করল। সন্দীপনি যখন এলেন গুরুদেব চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, বাবা, তোমায় কী জিনিস দেব। তোমাকে দেবার কিছুই নেই। তোমার যা গুরুভক্তি তার তুল্য আর কিছুই নেই। আমি আশীর্বাদ করছি, ত্রিলোকের নাথ ভগবান তোমার শিষ্য হবেন।

পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এই সন্দীপনি মুনিরই শিষ্য হয়েছিলেন।

বীর বনবাসী

জতরা ভগত

জতরা ভগত ওরফে জতরা ওরাঁও ১৮৮৮ সালে অধুনা ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলার বিশনপুর থানার চিমগরী নওয়াটোলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ থেকে ১৯১৪ এই দুই বছর তিনি ব্রিটিশ সরকার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। তিনি মানুষকে সরকারি ট্যাক্স না দিতে এবং জমিদারের বেগার না খাটতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে উলগুলান আন্দোলন থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। ওরাঁও সমাজের মানুষদের তিনি নানাবিধ কুপ্রথা থেকে মুক্ত করেন। বৈষ্ণব ভাবধারায় তিনি সমাজ রচনা করেছিলেন। ১৯১৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। আজও তাঁর স্মরণে তাঁর জন্মস্থানে পৌষমেলার আয়োজন করা হয়।

জানো কি?

- এশিয়ান গেমস ২০২৩-এ ভারতীয় দলের অফিসিয়াল স্পনসর ছিল আমুল কোম্পানি।
- এবারের এশিয়ান গেমসে ভারত সব থেকে বেশি পদক জিতেছে অ্যাথলেটিক্সে।
- এশিয়ান গেমস চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রথমবার এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫১ সালে নয়াদিল্লিতে।
- এশিয়ান গেমস ভারতে দু'বার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- চীনে অনুষ্ঠিত এবার ছিল ১৯তম এশিয়ান গেমস।

ভালো কথা

গাছফোঁটা

এবার আমাদের অন্যরকম ভাইফোঁটা হলো। আমরা এবার গাছে গাছে ফোঁটা দিলাম। ৩৫ জন দিদি ও বোন মিলে ২০০টি গাছে ফোঁটা দিয়েছি। ফোঁটা দিয়ে গাছের গোড়ায় জল দিয়েছি। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি আর গাছ যেন কেউ না কাটে তা লক্ষ্য রাখবো আর চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রতিদিন গাছে এক বালতি করে জল দেব। আমাদের পাড়ার বড়োরাও আমাদের একাজে উৎসাহিত করেছে। মিলিদিদির ঠাকুমা আমাদের গাছফোঁটার কথাটা বলেছিল। ফোঁটা দিয়ে আমরা এক জায়গায় যখন বসলাম তখন ঠাকুমা বলল, শুধু ফোঁটা দিলেই হবে না, রাখি বন্ধনের দিন গাছগুলিকে রাখি পরাতে হবে, তাছাড়া বছরে একটা নতুন গাছ লাগাতে হবে। আমরা তাও করব, ঠাকুমাকে কথা দিয়েছি।

সমৃদ্ধি মহান্তি, একাদশ শ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) নু বা কূ তা	(১) ম রা ব গ হি ন
(২) আ ণী কা বা	(২) দ দ বা বা তি প্র

১৩ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) চোরাগোপ্তা (২) ছন্নছাড়া

১৩ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) ছায়াসুনিবিড় (২) ছিদ্রানুসন্ধান

উত্তরদাতার নাম

(১) অনিশ দাস, গল্ফগ্রীন, কলকাতা-৯৫। (২) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা - ৪৯
(৩) সুজিত মাহাত, চিঙ্গিশপুর, দঃ দিনাজপুর। (৪) অনন্যা সাহা, ফারাক্কা ব্যারেজ কলোনি, মুর্শিদাবাদ।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

With Best Compliments from -

A
Well wisher

কেদারনাথের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেয়নি কেউই

কেদারনাথে প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞ থেকে শিক্ষা নিইনি আমরা। শিক্ষা নেব না সিকিমের লোনক থেকেও। আগামীদিনে আবহাওয়া বদল এবং উষ্ণায়ন সম্পর্কে সতর্ক না হলে আরও বড়ো বিপর্যয় অনিবার্য।

হীরক কর

১৭ জুন ২০১৩। প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছিল কেদারনাথ। এতে প্রায় দশ হাজার মানুষ ভেসে গিয়েছিল। উত্তরাখণ্ড সরকারের মতে, ১৪ জুন থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত ৩.৫ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছিল। এই বৃষ্টিপাত জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষাকালেও হয় না। বর্ষণের (৩০০ থেকে ৫০০ মিলিমিটার) কারণে এবং পর্বতগাত্রে গ্লেসিয়ার বিস্ফোরিত হয়ে বরফ গলনের ফলে এই ব্যাপক বন্যা হয়। কেদারনাথ থেকে আরও একটু উপরে উঠলে মোটামুটি ৩.৫ কিলোমিটার ট্র্যাকে হাঁটলে পৌঁছে যাওয়া যায় চোরাবারি তাল বা চোরাবারি লেক বা গান্ধী সরোবরে ভারী বর্ষণের কারণে উপচে পড়ার মতো অবস্থায় ছিল এই লেক। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বর্ষণে পর্বতগাত্র ধসে আটকে যায় জলের প্রবাহ। ওইদিকেই কোনো এক স্থানে ঘটে যায় মেঘের বিস্ফোরণ। একদিকে ভারী বর্ষণের ফলে উপচে পড়া চোরাবারি লেক আর অন্যদিকে এই বিস্ফোরণের ধাক্কা— সামলে উঠতে পারে না হিমালয়ের এই পাহাড়ি উপত্যকা। সেই প্রবল ধাক্কায় ফাটল ধরে পর্বতগাত্রের গ্লেসিয়ারেও। সেটাও বিস্ফোরিত হয়; ব্যাপকভাবে বরফ গলতে শুরু করে। এই সবকিছু হয় এক সঙ্গে। ধসে যায় পর্বতগাত্র। এর ফলে আটকে যাওয়া পাহাড়ি নদীর মুখে প্রবল স্রোতের সৃষ্টি করে। তারপর মেঘের বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসা বড়ো বড়ো পাথর নিয়ে সেই প্রবল স্রোত এসে আছড়ে পড়ে নীচে— কেদারানাথ ধামে। আরও নীচে গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত ভেসে যায় সবকিছু।

কত লোক মারা যায় তার কোনো সঠিক হিসেব আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয় প্রায় ১ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল ইতিহাসের এই ভয়ংকরতম হড়পা বানে। আর এই প্রবল জলের তোড়ে রূপবতী মন্দাকিনী নদী তাঁর ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। ধারাবাহিক ভাবে বৃষ্টিপাতের কারণে নদীগুলো বিপদ চিহ্নের উপরে প্রবাহিত হতে থাকে। মন্দিরের দিকে জল ঘুরিয়ে, কাদা ও ধ্বংসাবশেষ

ফঃ ৬

প্রবেশ করতে শুরু করে। কিন্তু কেদারনাথের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেয়নি কেউই। না কেন্দ্রীয় সরকার। না রাজ্য সরকার। না সচেতন হয়েছে সাধারণ মানুষ। মাঝে কেটে গেছে দশ দশটি বছর।

৪ অক্টোবর, ২০২৩। উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ বিপর্যয়ের কথা ফের মনে করিয়ে দিল সিকিমের বিপর্যয়। ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে উত্তর সিকিম। ৪ অক্টোবর ভোরে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে লোনক হ্রদ ফেটে হুহু করে জল নেমে আসে তিস্তায়। আচমকা হড়পা বানে তিস্তার জলস্তর বেড়ে যায় ১৫-২০ ফুট। সিকিমের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার জেরে তিস্তায় জলস্তর বৃদ্ধি পায়। আরও জল বাড়তে পারার আশঙ্কাও করেছিল প্রশাসন। এমনকী, তিস্তার স্রোতে একাধিক মৃতদেহ ভেসে আসতেও দেখা যায়। জলপাইগুড়ির গজলডোবায় তিস্তা ব্যারেজের লকগেটে ৮টি মৃতদেহ আটকে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।

কে চিনত লোনক লেক-কে? রাতারাতি সংবাদের শিরোনামে চলে আসে হিমালয়ের এই হ্রদ। মেঘভাঙা বৃষ্টি, সঙ্গে লোনক হ্রদ উপচে পড়ায় তিস্তায় হড়পা বান। ফুঁসছে তিস্তা। বিপর্যস্ত সিকিমের জনজীবন। হড়পা বানে ভেসে গিয়েছিল সেনা ছাউনি। নিখোঁজ ছিলেন ২৩ জন জওয়ান। তাঁদের মধ্যে একজনকে উদ্ধার করা গিয়েছিল। উদ্ধারকার্য চলছিল। তখনও নিখোঁজ বহু মানুষ। মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জনের। সেই পরিস্থিতিতে স্যাটেলাইটের ছবিতে দেখা গিয়েছে, কীভাবে বিপর্যয়ের আগে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল লোনকের জলস্তর। ইসরো ইতিমধ্যে সেই ছবি প্রকাশ করেছে। ইসরোর প্রকাশ করা ওই ছবিগুলোতে লোনকের বিপর্যয়ের আগের এবং পরের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর, ২৮ সেপ্টেম্বর এবং ৪ অক্টোবরের লোনকের তিনটি ছবি প্রকাশ করেছে ইসরো।

তাতে হ্রদের জলের পরিমাণের পরিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে। যাতে দেখা গেছে সেপ্টেম্বরের দিনগুলোতে হ্রদের আকৃতি ছিল ১৬০ হেক্টরের আশেপাশে। কিন্তু ৪ অক্টোবর তার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ৬০.৩ হেক্টরে পরিণত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে লোনকের বিপর্যয় আসলে একটি গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড। সেই মুহূর্তে ওই হ্রদের ৬০ শতাংশের বেশি জল বেরিয়ে গেছে এবং মাত্র ৩৭ শতাংশ জল রয়েগেছিল হ্রদে।

দেশের বাকি অংশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল সিকিম। এই প্রতিবেদন লেখার সময়ে পশ্চিমবঙ্গ-সহ অন্যান্য রাজ্যের ৩ হাজার পর্যটক সেখানে আটকে পড়েছেন। তখনও পর্যন্ত নিখোঁজ আরও ১০০ জন। মৃত ১৪ জন। সিকিম সরকারের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, হড়পা বানে ১৪টি সেতু ভেঙে পড়েছে। চুংথাংয়ে তিস্তা স্টেজ-৩ বাঁধে ১৪ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। তাঁরা সুড়ঙ্গে আটকে পড়েছিলেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে আহত অবস্থায় ২৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এর জেরে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের তিস্তার ফকতের চর, এলাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছিল। চরের বাসিন্দারা বাড়িঘর ছেড়ে গৃহপালিত পশু, ধান-পাট-সহ বিভিন্ন জিনিসপত্তর নিয়ে চর থেকে উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল। তারা প্রায় শতাধিক পরিবার। মাথাভাঙা-১ ব্লকের কেদারহাট এলাকায় জল বাড়ার আশঙ্কায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়েছিল।

লোনক লেকের বিপর্যয় বিপর্যয়ের মূলে উষ্ণায়ন এবং আবহাওয়ার ক্রমিক বদলই দায়ী। তবে এই বদল অবশ্য সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ঘটেনি। উষ্ণায়ন বৃদ্ধির জন্য সবার অলক্ষেই পরিবেশের বিভিন্ন অংশে বেশ কিছু বদল ঘটে গেছে। তাঁর ফল আমরা এতদিনে টের পাচ্ছি। হিমবাহ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সারা বিশ্বে উষ্ণায়ন বেড়ে চলেছে। এর ফলে মেঘভাঙা বৃষ্টি, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, হিমবাহ গলে গিয়ে ভয়ংকর আকার নিচ্ছে। এর সঙ্গেই যুক্ত হচ্ছে সমুদ্রের তলদেশ উষ্ণ হয়ে ওঠার ঘটনা।

ভূতত্ত্ববিদ, আবহাওয়াবিদ এবং পরিবেশ বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, উত্তর হিমালয়ের বহু অংশেই উপ-হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ হিসেবে তাদের ধারণা, পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্যই হিমালয়ের বড়ো অংশ গলে যাচ্ছে। সেই বরফ গলা জল আশ্রয় নিচ্ছে পাহাড়েরই কোনো না কোনো খাঁজে। লোনক হ্রদের মতো বড়ো পরিসরে থাকা হ্রদগুলোতে হিমবাহ গলে যাওয়ার ফলে চাপ বাড়ছে। হ্রদের আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায় চলে যাচ্ছে। আড়েবহরে কঠিন পাথরেরও প্রসারণ ঘটছে। এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা এবং উষ্ণায়নের গভীর অসুখ। ফাটল ধরে গেছে হিমালয়ের ছোটো বড়ো অনেক হ্রদেই। 'ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ইসরো ইতিমধ্যেই লোনক হ্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। বছর দুই আগে আবহাওয়া পরিবর্তন নিয়ে একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, লোনক হ্রদ দৈর্ঘ্যে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তখনও বোঝা যায়নি হিমাবাহও গলে গিয়ে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করবে।

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-র হিমালয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ফারুক আজমের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে হিমাবাহ বিশেষজ্ঞ মানুষটি বলছিলেন, 'যখন হিমবাহ গলতে শুরু করে তখন তার চাপে পাথরের অংশ, কাদামাটি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। একসময় নীচের দিকে বইতে থাকে জলস্রোত। তখন তা হয় ভয়াবহ বন্যা এবং বেশ বড়ো আকারে ধসের সৃষ্টি করে। আমরা জানি, হিমবাহগুলো পাহাড়ের গভীর অংশে থেকে যায়। বছরের পর বছর প্রাকৃতিক কারণে সেখানেই আটকে থাকে। উষ্ণায়নের ফলে বরফ গলা শুরু হলে তখন যে আধারে ছিল তা থেকে সরে আসতে থাকে। লোনকের ক্ষেত্রে সেই ঘটনাই ঘটেছে।'

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল মেটেরোলজির আবহাওয়া বিজ্ঞানী ড. রক্সি মামুকোল বলেন, 'হিমালয়ের পুরো ভাগ মোটামুটি ভাবে বর্ষায় ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। যা আগে থেকে বোঝা যায় না। আমরা জানি হিমালয়ের ওই অংশটি বরাবরই মেঘভাঙা বৃষ্টির জন্য চিহ্নিত। কিন্তু কোনো কোনো অংশ বেশি বিপজ্জনক তা এখনো চিহ্নিত করে ওঠা সম্ভব হয়নি। এই কাজটি এখনই শুরু করা উচিত'।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অগভীর জলাশয়গুলো তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, যা ঠাণ্ডা জলের প্রজাতির জন্য তাজা জলের

বাসস্থানের প্রাপ্যতা হ্রাস করে। গভীর হ্রদের উষ্ণ জলের তাপমাত্রা সেই প্রক্রিয়াগুলোকে ধীর করে দেয় যা জলে অক্সিজেন যোগ করে মৃত অঞ্চল তৈরি করে হিমবাহ গলিয়ে দেয়।

'ইন্ডিয়ান স্কুল অব বিজনেস' 'ভারতী ইনস্টিটিউট অব পাবলিক পলিসি', 'আইপিসিসি'র বিশেষজ্ঞা ক্লিনিক্যাল অ্যাসোসিয়েটস প্রফেসর অঞ্জল প্রকাশের মতে, 'উষ্ণায়ন ও হিমবাহ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রটি আরও বিস্তৃত করা প্রয়োজন। যাতে কোনো কোনো অঞ্চল অনেক বেশি সমস্যাসংকুল হয়ে রয়েছে তা বোঝা যায়। হিন্দুকুশ হিমালয় রিজিয়নে প্রায় ৫৪ হাজারেরও বেশি হিমবাহ রয়েছে। যার মধ্যে খুব কমই শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় আগামীদিনে বিপর্যয় আরও ভয়ংকর হতে পারে। তার বক্তব্য, এই অঞ্চলগুলো নিয়ে গবেষণা বিস্তৃতি না বাড়ালে ভবিষ্যতে খেসারত দিতে হতে পারে। সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য প্রফেসর মহেন্দ্র শ্রী লামা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'এই ধসের ঘটনা বড়োই দুঃখজনক। আমরা ২০০১ সালে তিস্তার বন্যা এবং গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট নিয়ে সতর্ক করেছিলাম। ২০১২ সালেও বলা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনো কোনো কাজ এগোয়নি'।

> **সারা বিশ্বে উষ্ণায়ন বেড়ে চলেছে। এর ফলে মেঘভাঙা বৃষ্টি, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, হিমবাহ গলে গিয়ে ভয়ংকর আকার নিচ্ছে। এর সঙ্গেই যুক্ত হচ্ছে সমুদ্রের তলদেশ উষ্ণ হয়ে ওঠার ঘটনা।**

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় স্পেশাল সেন্টার ফর স্টাডিজ অব নর্থ ইন্ডিয়া-র অধ্যাপক বিমল খাবাশের পরামর্শ, 'যখনই পাহাড়ে কোনো বিপর্যয় হয় তখনই এইসব নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। আবহাওয়া বদল এবং উষ্ণায়ন নিয়ে এখন থেকেই সতর্ক হয়ে কাজ শুরু করা উচিত।

সাউথ লোনক লেকের পর এবার ভাঙনের মুখে উত্তর সিকিমের আরও এক হিমবাহ গলা জলে সৃষ্টি হ্রদের নাম, 'সাকো চো'। জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। তার জেরে ফের আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত গোটা তিস্তা অববাহিকায়। তবে এবার বিপদ শুধু সেখানে সীমাবদ্ধ নয়। ওই হিমবাহ-হ্রদ ফেটে গেলে ভাসতে পারে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স পর্যন্ত অংশও। কারণ, আচমকা হড়পা বানে জলস্ফীতি হলে বিপদসীমা ছাপিয়ে যাবে ডুয়ার্সের নদীগুলোর। এই আশঙ্কায় নতুন করে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে সেখানকার বাসিন্দা, এমনকী পর্যটকদের মধ্যেও। সাউথ লোনকের গ্লফ বিপর্যয়ে সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের ৫৩ জনের দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে বলে খবর। এর মধ্যে ২৬টিই মিলেছে পড়শি রাজ্য সিকিমে। বাকিগুলো এরাজ্যের তিস্তা অববাহিকার বিভিন্ন অংশে পাওয়া গেছে। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিংহ তামাং গোলে জানিয়েছেন, বিপর্যয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করছে বিশেষজ্ঞ কমিটি। তিস্তা নদীর উপরে থাকা ১৩টি ব্রিজ ভেঙে গিয়েছে। রাজ্যের অন্য অংশ থেকে উত্তর সিকিম পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যেই নতুন করে বিপদের সম্ভাবনা বাড়াচ্ছে 'সাকো চো' লেক।

মঙ্গন জেলার ওই হ্রদটি জলের চাপে যে কোনও মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারে। ফলে ফের 'গ্লোসিয়ার লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড' (গ্লফ) হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিপদ এড়াতে লেক থেকে ১২ কিমি দূরে লাচেন উপত্যতার থাঙ্গু, চেলা ও ইয়াথাং গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খালি করে দেওয়া হয়েছিল গ্যাংটক জেলার সিংতামের গোলিতার, মঙ্গনের দিকচু এবং পাকিয়ঙের রংপো আইবিএম এলাকা। তবে খারাপ আবহাওয়ার কারণে লাচেন থেকে পর্যটকদের তখনও উদ্ধার করা যায়নি। এই আবর্তেই পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত দপ্তরের শীর্ষ কর্তারা আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন, তিস্তার জল নামলে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের সিংহভাগ অংশই ভেঙে পড়বে।

উত্তর সিকিমের ১৬ হাজার ৪০৪ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত 'সাকো চো' লেক। সাউথ লোনকের চেয়ে আয়তনে কম হলেও, এটির গভীরতা অনেক বেশি। কয়েকদিনে সেটির জলস্তর প্রায় ৬ মিটার বেড়েছিল। এমনকী সংলগ্ন এলাকার আবহাওয়াও ক্রমশ 'গরম' হচ্ছে বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের। ৫৯৪ ফুট গভীর 'সাকো চো'র উপরে রয়েছে এক হাজার মিটার উচ্চতার একটি হিমবাহ। উষ্ণায়নের কারণে গত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত গলছে সেখানকার বরফ। সেই বরফগলা জলেই এখন টইটম্বুর 'সাকো চো'। বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা সেই লেক থেকে জল নিষ্কাশন, মেটেওরোলজিক্যাল ও হাইড্রোলজিক্যাল স্টেশন এবং রিমোট অটোমেটিক ওয়াটার লেভেল মনিটরের মতো আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেটাও গত বছরের জানুয়ারি মাসে। মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল ডিজাস্টার মনিটারিং অথরিটি এর জন্য ২০ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার একটি পাইলট প্রকল্পও হাতে নিয়েছিল। তা অবশ্য বাস্তবায়িত হয়নি।

কেদারনাথে প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞ থেকে শিক্ষা নিইনি আমরা। শিক্ষা নেব না সিকিমের লোনক থেকেও। আগামীদিনে আবহাওয়া বদল এবং উষ্ণায়ন সম্পর্কে সতর্ক না হলে আরও বড়ো বিপর্যয় অনিবার্য। আশপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ বাঁচাতে না পারলে আমাদের সুখে-দুঃখে বেঁচে থাকার দিন শেষ, একথা হলপ করে বলার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞের দরকার পড়বে না। সেটাও হলপ করে বলাই যায়। □

মামণিরা মরলে দিদির কী!

পথশ্রীপ্রবক্তাযু দিদি,

সবাই আপনাকে দোষ দিচ্ছে। এসব কি আপনার দেখার কথা? গোটা দেশে যাতে বিজেপি বিরোধী জোট হতে পারে তার চেষ্টা আপনাকে করতে হচ্ছে। যদিও যা অবস্থা তাতে 'আই.এন.ডি.আই.এ' নামক জোট এখনই কোমায় পৌঁছে গিয়েছে। আবার ভাইপো, দাদা, বউদি, ভাইপো-বউকে বাঁচানোর কথা ভাবতে হচ্ছে।

নিজের শরীর-মন দু' টোই ঠিক নেই। ভাইগুলো একের পর এক জেলে। আরও অনেকে নাকি লাইন দিয়ে রয়েছে। তার উপরে খেলা, মেলা করতে গিয়ে টাকাপয়সা বিশেষ নেই। আবার আদালতে প্রায় প্রতিদিনই মুখ পুড়ছে। ধর্মতলায় বিজেপির জনসভা আটকানোর চেষ্টা করে লাভ হয়নি। লগ্নি টানার ব্যর্থ চেষ্টার জন্য বাণিজ্য সম্মেলন করতে হচ্ছে, সামনেই আবার দলের বার্ষিক অনুষ্ঠান কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। সেই সময়ে এই রকম 'ছোটোখাটো' বিষয় নিয়ে কি আপনার আদৌ মাথা ঘামানোর সময় আছে? আমি বুঝি, কিন্তু বিরোধীরা সে সব না বুঝে আপনাকেই দোষ দিচ্ছে। আপনি অবশ্য চুপ। ঠিকই করেছেন চুপ থেকে।

কোন ঘটনাটা বলছি বুঝতে পারছেন তো! ওই যে মালদহের ঘটনাটা। মনে পড়েছে, আচ্ছা, মনে করিয়ে দিচ্ছি। ওই যে গত সপ্তাহে মালদহে বেহাল রাস্তা ধরে বেশি দূর এগোতে পারেনি অ্যাম্বুল্যান্স। অগত্যা মুমূর্ষু রোগীকে খাটিয়ায় তুলে এবং কাঁধে নিয়ে হাসপাতালের নিয়ে হাসপাতালের পথে রওনা দিয়েছিলেন রোগীর পরিজনেরা। তাতেও অবশ্য শেষরক্ষা হলো না। পথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন অসুস্থ তরুণী। মনে পড়েছে দিদি? মালদহের বামনগোলা থানার মালডাঙা গ্রাম। খাটিয়ায় রোগী নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য তো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। টিভিতে না হলেও মোবাইলে তো দেখেছেন নিশ্চয়ই।

মালডাঙা গ্রামের বাসিন্দা, বছর পঁচিশের তরুণী মামণি রায়। ক'দিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে ভর্তি করানোর জন্য তরুণীর পরিজনেরা অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে পাঠান। কিন্তু বেহাল রাস্তায় অ্যাম্বুল্যান্স দূরস্থান, ওই গ্রামে কোনও যানবাহনই ঢোকে না। এই অবস্থায় কোনও উপায় না দেখে মুমূর্ষু ওই তরুণীকে খাটিয়ায় তুলে গ্রামের মেঠো পথ পেরিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়। গন্তব্য ছিল বামনগোলার গ্রামীণ হাসপাতাল। কিন্তু বেহাল রাস্তা পেরিয়ে হাসপাতালে পৌঁছতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তরুণীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

> **কেউ কি জানত ২০২৩ সালের উন্নত পশ্চিমবঙ্গে, সব কাজ হয়ে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গে, পথশ্রী পশ্চিমবঙ্গে এক কন্যার মৃত্যু হবে খারাপ পথের জন্য। এ প্রশ্ন কিন্তু থেকেই গেল।**

এর পর থেকেই সবাই আপনাকে মানে আপনার সরকারকে দুষছে। কিন্তু আপনার কী করার আছে এই সব 'ছোটোখাটো' মৃত্যু নিয়ে। কে কোথার মামণি! একটাই তো ভোট। সে ওর পরিবারের কাউকে সিভিক ভলেন্টিয়ার করে দিলে কাজ মিটে যাবে। তবে দিদি প্রশ্ন অন্য জায়গায়। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার এক বছরের মাথায় আপনি বলেছিলেন, সরকার একশো শতাংশ কাজ করে ফেলেছে। এই গ্রামের রাস্তাটাই মনে হয় বাকি ছিল। সেটা ২০১২ সালে। এটা ২০২৩ সাল। কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ সড়ক যোজনায় কোটি কোটি টাকা পাঠিয়েছে এই সময়ের মধ্যে। আপনি আরও দু'বার ক্ষমতায় এসেছেন। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা দিয়ে রাজ্যের নামে প্রকল্প হয়ে কাজ হয়েছে। প্রচুর টাকা আপনার ভাইয়েরা চুরি করেছে বলে আপনি কেন্দ্রকে হিসাবও দিতে পারছেন না। কিন্তু সব কাজ হয়েছে বলে আপনি দাবি করেছেন। সম্প্রতি আবার রাজ্যের টাকায় 'পথশ্রী' প্রকল্প চালু করেছেন। কিন্তু সেই টাকা মালডাঙা গ্রামে গিয়ে পৌঁছয়নি। নাকি মাঝপথে কোনও ভাইয়ের টাঁকশালে জমা পড়ে রয়েছে কে জানে।

আপনি মুখ না খুললেও আপনার এক মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেছেন, এই মৃত্যু মামণির কপালে লেখা ছিল। হয় তো তাই! সবার মৃত্যুই তো কপালে লেখা থাকে। কে, কবে, কী ভাবে মারা যাবে কে বলতে পারে? এই যেমন কেউ কি জানত ২০২৩ সালের উন্নত পশ্চিমবঙ্গে, সব কাজ হয়ে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গে, পথশ্রী পশ্চিমবঙ্গে এক কন্যার মৃত্যু হবে খারাপ পথের জন্য। এ প্রশ্ন কিন্তু থেকেই গেল। থেকেও যাবে। □

বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের হার খুশি করলো কাদের?

এবার ক্রিকেট বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের খেলায় ভারতের নিরঙ্কুশ জয়, অংশগ্রহণকারী দশটি দেশের মধ্যে প্রতিপক্ষ ন'টি দেশকে প্রত্যেককে হারানো, সেমিফাইনালে দুরন্ত জয়, এরপরে ভারতবাসী যদি ফাইনালে জয়ের আশা করে থাকেন, তবে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। এর আগে কোনো বিশ্বকাপে এরকম নিরঙ্কুশ আধিপত্য ভারত দেখাতে পারেনি। অবশ্য কেই-বা পেরেছে? সাম্প্রতিক অতীতে অস্ট্রেলিয়া, আর সেকালের ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাদ দিয়ে এরকম দুরন্ত পারফরম্যানসের নজির কারোর ছিল না।

এবারের বিশ্বকাপের সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় বোধহয় ২০০৩ সালে সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ক্রিকেট দলের পারফরম্যান্স, তবু সেবারে গ্রুপ লিগের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত হেরেছিল, তারপরে ফাইনালেও একই ফলের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। সান্ত্বনা ছিল যোগ্যতম দল হিসেবেই অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এবার ফাইনালে হারের পর সেই সান্ত্বনাটুকুও দেওয়ার উপায় নেই। কারণ বিশ্বকাপের যোগ্যতম দল হিসেবে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। গ্রুপের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে পর্যুদস্ত করলেও ফাইনালে হারের কারণে তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জয় থেকে ভারত বঞ্চিত রইল।

ইংরেজিতে 'ল অব এভারেজ' বলে একটা কথা খুব প্রসিদ্ধ। মানে যোগ্যতাপর্বে একটা দল সব ম্যাচ জিতলেও চূড়ান্ত ম্যাচে অর্থাৎ ফাইনালে সে উপরোক্ত সূত্রানুযায়ী হারতেও পারে। অতীতেও বিশ্বক্রিকেটে এই নজির দেখা গিয়েছে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ভারত ফাইনালে হারলেও ২০২৩-এর বিশ্বকাপে তারাই যোগ্যতম দল হিসেবে প্রমাণিত।

আমাদের বিশ্বাস, ভারতের ফাইনালে এই হার শুধু ভারতবাসীকেই নয়, সারা বিশ্বের আপামর ক্রিকেট অনুরাগী জনতাকে আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় বেদনাহত করেছে। কিন্তু এক শ্রেণীর ভারতে বসবাসকারী মানুষজনকে এই হারে বর্বরোচিত উল্লাস করতে দেখে বিস্ময় জাগে বই কী। বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত যখন হারছে, তখন কিছু বিশেষ এলাকা থেকে বাজি-পটকার উল্লাসের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। এই ঘটনা এদেশে নতুন নয়। একে যাও-বা মানা গেল, সোশ্যাল মিডিয়ায় একশ্রেণীর মানুষের ভারতের হারে যেন উল্লাসের সীমা-পরিসীমা নেই। উল্লাসের কোনো ক্রিকেটীয় যুক্তি নেই। কেন নরেন্দ্র মোদীর নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে ফাইনাল হলো? নরেন্দ্র মোদী কেন সপার্ষদ খেলা দেখলেন ইত্যাদি অক্রিকেটীয় যুক্তিতে ফেসবুক ওয়াল ভরে গেছে। শচীন তেন্ডুলকরের বিদায়ী ম্যাচের প্রাক্কালে সৌরভ গাঙ্গুলি একটি জনপ্রিয় টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, এদেশে মৃত্যুর পর মানুষের স্মৃতিতে রাস্তাঘাট ইত্যাদির নামকরণ হয়। যদি মানুষটিকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতেই হয়, তবে বেঁচে থাকতেই তাঁর স্মৃতি ধরে রাখার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে বলে সৌরভের অভিমত ছিল। খুব সুন্দর যুক্তি। তাই জীবদ্দশায় নরেন্দ্র মোদীর নামে স্টেডিয়াম করা কোনো ফাঁসিযোগ্য অপরাধ নয়। সেই স্টেডিয়ামে কোনো খেলায় ভারত হারলে স্টেডিয়ামের নামকরণের দোষ হতে পারে না। যে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহদের স্টেডিয়ামে খেলা দেখা নিয়ে এতো আপত্তি, তাতে নাকি ভারতীয় ক্রিকেটারেরা খুব চাপে পড়ে গেছেন বলে অপযুক্তি দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের জন্য মহম্মদ শামীর একটি ফেসবুক পোস্ট যথেষ্ট। তাতে তিনি স্পষ্টই লিখেছেন, নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতি তাঁদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। এতো স্বাভাবিক কথা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকাপ ফাইনালে স্বয়ং উপস্থিত থেকে দেশের প্রতিনিধিত্বকারী ক্রিকেটারদের উৎসাহিত করবেন, এটাই তো হওয়া উচিত। আমাদের মনে আছে, বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে শামীর অসাধারণ বোলিঙের পর তাঁর ধর্মীয় পরিচয় তুলে ধরে কেন্দ্রের শাসক দলকে খোঁটা দেওয়ার মতো নোংরামি আমরা দেখেছি।

উপরে উল্লেখিত পোস্টের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়, যখন দেখি ভারতের এই হারে নরেন্দ্র মোদী ২০২৪-এর নির্বাচনের আগে তাঁর কাঙ্ক্ষিত লাভ ঘরে তুলতে পারলেন না, এই অনুমানে ফেসবুক জুড়ে উল্লাস শুরু হয়ে যায়। আসলে দেশের সম্মান আর রাজনীতির ভেদরেখা অনেকে গুলিয়ে ফেলছেন। ভারতীয় সেনার বালাকোটে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা সম্প্রতি চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্যের ভূত এখনও অনেককে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশী একটি দেশ, নিজেদের বাঙ্গালি বলে যাঁরা পরিচয় দেন, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের ধ্বজা ওড়ান, বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের হারে তাঁরাও যারপরনাই খুশি। তাঁদের দেশের বিশ্বকাপে পারফরম্যান্স যদিও যাচ্ছেতাই। যদিও অবোধের গোবধেই আনন্দ। শুধু মনে করাই, একদা তাঁরা যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও টেস্ট খেলিয়ে দেশের মর্যাদা পেয়েছিলেন এক ভারতীয়, এ রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থা সিএবি-র প্রাক্তন সভাপতি জগমোহন ডালমিয়ার সৌজন্যেই। এখনও সেই দেশটি আর্থ-সামাজিক ভাবে কতটা ভারতের ওপর নির্ভরশীল তা বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু বেইমানের রক্ত কৃতঘ্নতাতেই আনন্দ পায়, একথাও মনে রাখা দরকার। আর কৃতঘ্নতার (যে উপকারীর অপকার করে) উপযুক্ত শাস্তিও কিন্তু সময়েরই দাবি। □

শার্দুলসিংহ জৈনের স্মরণসভা

দক্ষিণ কলকাতা দেশপ্রিয় ভাগের পূর্বতন সঙ্ঘচালক তথা রাজস্থান পরিষদের অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী শার্দুলসিংহ জৈন গত ৬ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। ১৭ নভেম্বর বড়বাজার অসোয়াল ভবনে তাঁর স্মৃতিতে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অখিল ভারতবর্ষীয় মারোয়াড়ী সভার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ শিবকুমার লোহিয়া। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, বিশিষ্ট শিল্পপতি শিশির কুমার বাজোজিয়া, বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাবীর প্রসাদ বাজাজ, পিঁজরাপোল সোসাইটির অধ্যক্ষ তথা কলকাতা পূর্ববিভাগ সঙ্ঘচালক রমেশ সরাওগী, মহাবীর ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ-এর সম্পাদক অশোক কোঠারী, বিশিষ্ট সমাজসেবী জতন পাঠক।

রাজস্থান পরিষদের মহামন্ত্রী অরুণ প্রকাশ মল্লাবত শোক প্রস্তাব পাঠ করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক জয়ন্ত পাল, পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের রাজ্য সম্পাদক সঞ্জয় রস্তোগী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিম কলকাতা জেলার মার্গদর্শক রামগোপাল সুঙ্খা, বড়বাজার লাইব্রেরির মন্ত্রী অশোক গুপ্তা, সেঠ সূরজমল জালান পুস্তকালয়ের মন্ত্রী শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস, রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘের অধ্যক্ষ রাজেশ আগরওয়াল (লালা), অসোয়াল ভবনের ম্যানেজার পান্নালাল সুরাণা, অসোয়াল স্পোর্টস ক্লাবের মন্ত্রী অনুরাগ নোপানী, প্রেমমিলনের সচিব চন্দ্রকান্ত সর্রাফ, সর্দার প্যাটেল সমিতির মন্ত্রী গুড্ঢন সিংহ, ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মকর্তা কিসন গোপাল গোয়েল, লাডনুঁ নাগরিক পরিষদের মন্ত্রী বিনোদ কুমার কুচেরিয়া, শ্রী ডীডওয়ানা নাগরিক সভার উপমন্ত্রী মনোজ কুমার কাকড়া, গঙ্গাশহর নাগরিক পরিষদের অধ্যক্ষ মদন কুমার মারোটী, মণ্ড্রেলা নগর বিকাশ পরিষদের মন্ত্রী শ্রীরাম সোনী, ফতেপুর শেখাওয়াটি প্রগতি সঙ্ঘের সচিব কালীপ্রসাদ ধোলিয়া, লোসল নাগরিক পরিষদের কর্মর্তা সীতারাম তিওয়ারী, বীকানের নাগরিক পরিষদের সংযোজক সঞ্জয় বিন্নানী, রতনগড় নাগরিক পরিষদের কর্মকর্তা মহেশ ভুয়ালকা, মিলন মেট্রমনী ট্রাস্টের ট্রাস্টি আলোক বাংঠিয়া, দধীচি সেবা ট্রাস্টের অধ্যক্ষ প্রদীপ সূঠওয়াল, সাফারি পার্ক লায়ন্স ক্লাবের মন্ত্রী ওমপ্রকাশ বাঁগড়, নিম্বীজোধা নাগরিক পষিদের মন্ত্রী অ্যাডভোকেট রাজারাম বিয়ানী, ভারতীয় সংস্কৃতি সংবর্ধন সমিতির রাজকুমার ভালা, সত্যপ্রকাশ রায়, রাজীব শরণ, পবন ধোলিয়া, সীতারাম ভাগা, পবন করওয়া প্রমুখ।

সকলেই শাদূল সিংহজীর স্মৃতিচারণ করেন এবং তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। স্মরণসভা সঞ্চালনা করেন বংশীধর শর্মা।

শোকসংবাদ

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক তথা উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য, সঙ্ঘের প্রচারক অঙ্কুর সাহার মাতৃদেবী গীতা সাহা গত ১৯ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ৩ পুত্রবধূ ও ৩ নাতি রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলার পুরশুড়া শাখার স্বয়ংসেবক এবং ভারতীয় জনতাপার্টির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি সুশান্তকুমার বেরার পিতৃদেব নিমাই চন্দ্র বেরা গত ১১ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। বাল্যকাল থেকে স্বয়ংসেবক ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর, তাঁর স্ত্রী ১ কন্যা তিনপুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর পরিবারের সকলেই স্বয়ংসেবক।

* * *

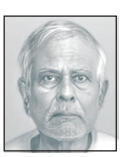

তারকেশ্বর জেলার পুরশুড়া শাখার স্বয়ংসেবক এবং প্রাক্তন প্রচারক পার্থ বেরার পিতৃদেব দুর্গাপদ বেরা গত ১৩ নভেম্বর ভোর ৫-২০ মিনিটে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর দুই পুত্র তিন কন্যা ও নাতি নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর পরিবারের সকলেই স্বয়ংসেবক।

কলকাতায় লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বর্ষশেষের প্রাক্কালে, আগামী ২৪ ডিসেম্বর কলকাতা ময়দানে ১ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন মঠ ও মন্দিরের তরফ থেকে 'সনাতন সংস্কৃতি সংসদ' গঠন করে তার অধীন 'লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ কমিটি'-র মাধ্যমে এই গীতা পাঠ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাতে গত ১৭ নভেম্বর দিল্লি যান স্বামী নির্গুণানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ ও বঙ্গ বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সাধু-সন্তদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সামনেই লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি ব্রিগেডে

গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাষ্ট্রপতিকেও। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে সূত্রের খবর।

মসজিদ থেকে ইটবৃষ্টি, মন্দিরে যাওয়ার পথে আক্রান্ত মহিলারা, ফের উত্তপ্ত হরিয়ানার নূহ

ফের হিংসা ও সন্ত্রাস নূহতে। গত ১৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার পুজো করতে যাওয়ার পথে বেশ কয়েকজন মহিলার দিকে পাথর ছোঁড়া হয়। মসজিদ এলাকা থেকেই তাঁদের দিকে পাথর ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত হন ৮ জন। তারপরেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে স্থানীয় জনতা। ডিএসপি জানান, ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত আগস্ট মাসে হরিয়ানার নূহতে ব্যাপক হিংসা ও সন্ত্রাসে ৬ জনের মৃত্যু হয়। ৩ মাসের মধ্যে ফের সন্ত্রাসের ঘটনা হরিয়ানায়। নূহের পুলিশ সূত্রের খবর, কয়েক জন মহিলা ও শিশু মিলে কুয়ো পূজন করতে যাচ্ছিলেন। সেই সময়েই তাঁদের লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু হয়। মসজিদ এলাকা পেরনোর সময়েই আক্রান্ত হন তাঁরা। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৬ নভেম্বর রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। আহত হন ৮ জন মহিলা। প্রাথমিকভাবে অনুমান, মসজিদ এলাকা থেকে কয়েক জন নাবালক পাথর ছুঁড়ছিল। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় এসপি জানান, ঘটনাস্থলের ভিডিয়ো খতিয়ে দেখছেন তাঁরা। মসজিদ সারানোর কাজ চলছিল, সেখান থেকেই মহিলাদের দিকে পাথর ছোঁড়া হয়। আপাতত অভিযুক্ত নাবালকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সেদিন রাত পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল বলেই দাবি পুলিশের। ঘটনার ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের হয়েছে। তবে পরদিন থেকে ফের অশান্তি শুরু হয় নূহতে। পাথর ছোঁড়ার ঘটনায় প্রবল বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামেন ডিএসপি বীরেন্দ্র সিংহ। সকলকে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে'। উল্লেখ্য, আগস্ট মাসে হিংসার পরে দীর্ঘ দিন অশান্ত ছিল নূহ। বন্ধ ছিল ইন্টারনেট পরিষেবা। পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হতেই ফের হিন্দুদের ওপর সন্ত্রাসের ঘটনা নূহতে।

MUNJAL SHOWA

Munjal Showa Ltd. is the largest manufacturer of Shock Absorbers, Front Forks, Struts (Gas Charged and Conventional) and Gas Springs for all the leading OEM's in 2 Wheeler/4 Wheeler Industry in the Country. Manufactured Products conform to strict its standard for Quality and Safety. Company's Products enjoy reputation for Smooth, Comfortable, Long-Lasting, Reliable and Safe Ride. The Company is QS 9000, TS – 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and TPM Certified Company. MSL has technical and financial Collaboration with Showa Corporation Japan.

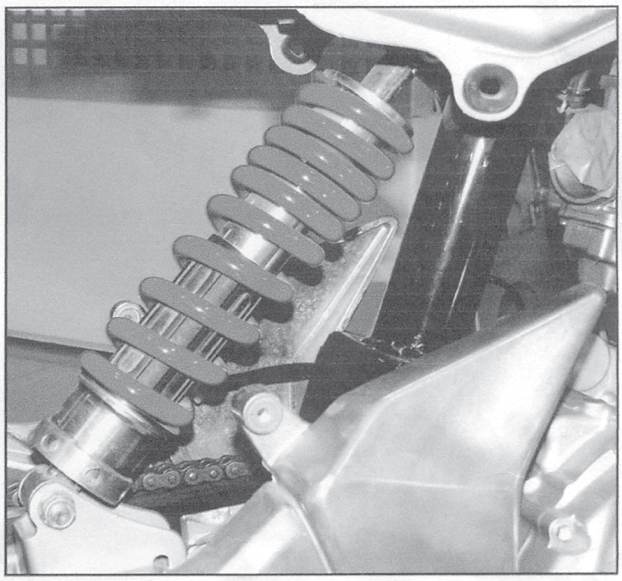

TPM Certified Company

ISO / TS - 16949 – 2002 Certified

ISO - 14001 & OHSAS – 18001 Certified

Our prestigious Client List :

- Hero MotoCorp Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.
- Honda Cars India Ltd.
- Honda Motorcycle & Scooter India (P) Ltd.
- India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

Our Products

- Struts/Gas Struts
- Shock Absorbers
- Front Forks; and
- Gas Springs

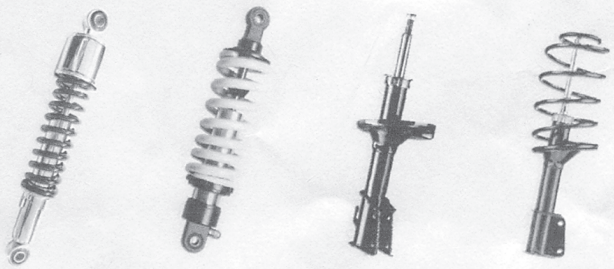

MUNJAL SHOWA LTD.

• Plot No. 9 – 11, Maruti Industrial Area, Gurgaon. Tel. No. : 0124 – 2341001, 4783000, 4783100
• Plot. No. 26 E & F, Sector – 3, Manesar, Gurgaon Tel. No. : 0124 – 4783000, 4783100
• Plot No.1, Industrial Park – II, Village Salempur, Mehdood – Haridwar, Uttarakhand Tel. No. : 0124–4783000, 4783100